মাসুদ রানা
আরেক গডফাদার
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

আরেক গডফাদার

কাজী আনোয়ার হোসেন

এরচেয়ে কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট আর পায়নি রানা। কাজে হাত দেওয়ার পর ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর অবিশ্বাস্য, অলৌকিক ক্ষমতা। তারপর দেখা হোল রূপ-যৌবনের আধার নাদিয়ার সঙ্গে; মেয়েটি ওর ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। উত্তর আমেরিকার চলিশজন মাফিয়া ডনকে এক জায়গায় জড়ো করছে রানা।

কে জানে এর পর কি হবে !

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩৪১

আরেক গডফাদার

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শ্যামল শাইখ
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ(BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে, ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

আরেক গডফাদার

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

এক

মাসুদ রানা ঢাকায় থাকলে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে প্রায় উৎসবমুখর একটা পরিবেশ তৈরি হয়; সবাই অপেক্ষা করে কখন কার সঙ্গে খুনসুটি করবে, কিংবা হঠাৎ বেসুরো গলায় কোন গান গেয়ে বা শেকসপিয়ারের কোন নাটকের আবেগঘন দৃশ্যে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দেবে।

উর্বর মস্তিষ্কে নতুন নতুন আইডিয়া গিজ গিজ করছে, ফলে সময় কাটানোর এই সব আয়োজন কখনও একঘেয়ে লাগে না। তবে, অদ্ভুতই বলতে হবে, ওর নিজের একঘেয়েমি আরও বরং গভীর হতে থাকে। কী ব্যাপার?

ব্যাপার হলো, নিজের একঘেয়েমি দূর করবার জন্য এ-সব করে রানা। সেটা শুরু হয় হাত যখন খালি থাকে, অর্থাৎ ওর হাতে যখন কোন অ্যাসাইনমেন্ট থাকে না।

ভয় পাওয়ার পরিবেশ আর চমকানোর ক্ষেত্র দরকার ওর, দরকার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার পরিস্থিতি আর মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ। ওর জিনের মধ্যে আছে রোমাঞ্চিত হওয়ার প্রবণতা, অশুভ শক্তির জড় উৎপাটনের দৃঢ় প্রত্যয়। এ-সব থেকে বেশিদিন দূরে সরিয়ে রাখলে স্রেফ অসুস্থ হয়ে পড়বে রানা।

সময়টা বন্ধ্যা যাচ্ছে। আজ প্রায় তিন হপ্তা হতে চলল ন'টা-পাঁচটা অফিস করে রানা ক্লান্ত। বন্ধু-বান্ধব আর সহকর্মীদের নিয়ে কত আর মেতে থাকা যায়, তাই এক হপ্তা ধরে নিজের কামরা ছেড়ে প্রায় বেরুচ্ছেই না। ওর এই করুণ অবস্থা দেখে প্রাইভেট সেক্রেটারি কাকলি দরজার নেমপ্লেটে, 'মাসুদ রানা'-র উপর সাদা চক দিয়ে যোগ করেছে 'খরাপীড়িত'।

আজও প্রায় সারাটা দিন শুধু কফি খেয়ে আর টেবিলে তোলা পা নাচিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে রানা। তবে অলস মস্তিষ্কে যার বাসা বাঁধবার কথা, সে শুধু বাসাই বাঁধেনি, ওকে একটা কুবুদ্ধিও যুগিয়েছে। সেজন্যই একটা অস্থিরতা অনুভব করছে ও। তবে বারবার চোখ বুলালেও ঘড়ির কাঁটা দ্রুত ঘোরে না, ছুটি হতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি।

পিপ্! পিপ্!

বাঁকা চোখে ইন্টারকমের দিকে তাকাল রানা। আরও দু'তিন বার বাজতে দিল ওটাকে, তারপর ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল। 'রানা।'

'ইলোরা।' বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের প্রাইভেট সেক্রেটারি সে। 'বস বলে গেছেন, তিনি না ফেরা পর্যন্ত অফিসেই থাকবে তুমি।'

'বলে গেছেন...তারমানে অফিসে বস্ নেই?'

'না।'

'জানতে পারি, ডাইনী...থুড়ি...ডারলিং ইলোরা, কোথায় গেছেন তিনি?'

জবাবে কিছু না বলে, অদ্ভুত একটা শব্দ করল ইলোরা—যেন ঢেঁকুর তুলল—তারপর যোগাযোগ কেটে দিল।

ব্যাপারটা কী হলো চিন্তা করছে রানা। বস্ বাইরে যাওয়ার আগে ইলোরাকে বলে গেছেন তিনি না ফেরা পর্যন্ত তাঁর প্রিয় শিষ্য যেন বেরিয়ে না যায়। কেন? তবে কী...নো, দিস ইজ ট্যু আরলি টু গেস্।

তবে সোহেলের অবশ্য জানবার কথা আসলে কী ঘটছে বা ঘটবে। ইন্টারকমের রিসিভার তুলে প্রিয় বন্ধুর নম্বর টিপল রানা। অপরপ্রান্তে পারভিন ধরল, সোহেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি। 'সোহেল ভাই? উনি তো নেই।'

'নেই...? কোথায় গেছে...কখন?'

'গেছেন তো সেই দুপুর বারোটায়, বসের সঙ্গে। কোথায় গেছেন তা তো আমি বলতে পারব না।'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে ভাবছে রানা। একবার ইচ্ছে হলো পাশের ঘর থেকে কাকলিকে ডেকে জিজ্ঞেস করে সে কিছু জানে কি না। এই সময় বিদ্যুচ্চমকের মত সন্দেহটা জাগল মনে—ওটা কি ঢেঁকুর তুলবার শব্দ ছিল, না কি কাঁদছিল ইলোরা?

আবার বোতামে চাপ দিল রানা। 'ইলোরা?' সিরিয়াস ও, তবে সুর নরম।

'বলছি,' ধরা গলা।

'কী হয়েছে তোমার, ইলোরা?' রানা উদ্বিগ্ন। 'তুমি কি কাঁদছ?'

অপরপ্রান্তে ইলোরা কথা বলছে না।

'কথা বলো, প্লিজ!' অনুরোধ করল রানা। 'কী হয়েছে বলো আমাকে।'

ইলোরা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'রানা,' একটু সামলে নিয়ে বলল ইলোরা, 'অনন্য...আমাদের অনন্য মারা গেছে!

'হোয়াট?' ঘুসির মত লাগায় ঝাঁকি খেল রানা। 'কী বললে?'

'হ্যাঁ, অনন্য নেই...'

ট্রেনিং শেষ করে নতুন এসেছে, বয়সে সবার ছোট, আর এসেই সবার মন জয় করে নিয়েছিল অনন্য রায়হান। 'কী-কীভাবে মারা গেল? কোথায়?'

ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে ইলোরা। 'কীভাবে মারা গেছে...খুন হয়েছে। কোথায় জানি না।'

'সোহেলকে নিয়ে বস্ কোথায় গেছেন, তাও জানে না?'

'ওঁরা এয়ারপোর্টে গেছেন। অনন্যর লাশ রিসিভ করতে।'

'কী করে জানলে?

একটু থেমে জবাব দিল ইলোরা। 'বসের চেম্বার থেকে খালি কাপ-পিরিচ নিয়ে বেরিয়ে আসছি, এই সময় বসকে কথাটা বলতে শুনলাম...'

'কী কথা?'

'বস সোহেলকে বললেন—"তোমরা আমার সন্তানের মত, সোহেল; তোমাদের কারও লাশ রিসিভ করতে আমি এয়ারপোর্টে যাব না তো কে যাবে?

এই খুনের বদলা নেয়া হবে, তার আগে যাদের লাশ তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি চলো"।'

রাত আটটা বাজতে চলেছে। নিজের অফিস কামরায় অস্থির পায়ে পায়চারি করছে রানা। একা। কাকলি অবশ্য থাকতে চেয়েছিল–কখন কী দরকার হয়, তা ছাড়া সঙ্গ দেওয়াও হবে। কিন্তু ছ'টা বাজতে তাকে এক রকম জোর করেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে রানা।

গোটা অফিস প্রায় খালিই বলা চলে। ছ'তলায় আছে রানা আর পারভিন, সাততলায় আছে ইলোরা–অবশ্য দুই ফ্লোরেই সিকিউরিটি গার্ডরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সোহেল বা বস, দু'জনের কেউই ফেরেনি এখনও। রাহাত খান অবশ্য আধ ঘণ্টা আগে টেলিফোন করেছিলেন ইলোরাকে। বলেছেন, তাঁর ফিরতে আরও কিছুটা দেরি হবে, রানাকে যেন অবশ্যই বসিয়ে রাখা হয়।

অনন্য রায়হানের কচি, প্রাণবন্ত চেহারাটা, কৌতূহল উপচে পড়া চোখ জোড়া মনের দরজায় ফুটে উঠতে দেখছে রানা। কী এক বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠছে বুকটা।

সাড়ে আটটার সময় অপেক্ষার অবসান ঘটল। ইন্টারকমে ইলোরা বলল, 'রানা? বস তোমাকে ডাকছেন।'

নিজের অফিসে তালা লাগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সাততলায় উঠে এল রানা। বুকের ভিতরটা টিপ্‌টিপ্ করছে।

আউটার অফিসে ব্যস্ত দেখা গেল ইলোরাকে, কমপিউটারের উপর চোখ রেখে টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। রানা ঢুকতে চোখের ইঙ্গিতে চেম্বারের দরজাটা দেখিয়ে দিল।

চেম্বারে ঢুকে কী দেখতে হবে রানা জানে না।

রাহাত খান আজ কালো সুট পরেছেন। বাইরে থেকে ফিরে একটা ফাইল খুলে ডেস্কে বসেছেন প্রায় দশ মিনিট হলো, অথচ আক্ষরিক অর্থেই সেই থেকে এক চুল নড়েননি তিনি। খোলা ফাইলে নিবদ্ধ দৃষ্টিও স্থির, চোখ দুটো যেন নড়াচড়া করতে ভুলে গেছে। তাঁর বসবার ভঙ্গিটাও অন্যান্য দিনের চেয়ে আলাদা, রিভলভিং চেয়ারটায় কেমন যেন ডুবে আছেন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে, আসল বয়সটাই ভাঁজ আর রেখা নিয়ে ফুটে আছে চেহারায়। সামনে সোহেল বসে আছে, কিন্তু ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি যেন সচেতন নন।

সোহেলও বিমর্ষ, তবে জানে এরকম পরিস্থিতিতে সচেতন থাকাটা জরুরি। বসের দিকে সরাসরি তাকিয়ে নেই, এমনকী চোরা চোখেও তাকাচ্ছে না, দৃষ্টি স্থির রেখেছে ডেস্কের ঠিক মাঝখানে। বস এক চুল নড়লেও টের পাবে সে। কখন কী বলেন শুনবার জন্য চোখের মত ওর কান দুটোও খাড়া হয়ে আছে।

এই সময় দরজায় নক করে ভিতরে ঢুকল রানা।

মুখ তুলে তাকালেন রাহাত খান। ওকে দেখে তাঁর চেহারায় সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন ঘটল: চোখে ধরা পড়ে কি পড়ে না এমনি ধীর গতিতে খাড়া হলো

শিরদাঁড়া, ফলে ডুবে থাকবার ভাবটা অদৃশ্য হলো; মুখে রেখা আর ভাঁজগুলো গভীরতা হারাল, বয়সের ছাপ সেই অনুপাতে কমে এল; আলোর ঝিলিক খেলল চোখের তারায়, দৃষ্টিতে ফিরে এল সজীবতা।

আর রানা দেখল, বস ওর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন; তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বসো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দম দেওয়া পুতুলের মত বসল রানা।

'অনন্যর মধ্যে আমি তোমার কিছু কিছু গুণ দেখতে পেয়েছিলাম।' বললেন রাহাত খান। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ডেস্কে কী যেন খুঁজতে শুরু করলেন। রানা সন্দেহ করল, বস সম্ভবত নিজেকে সামলে রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ততার আশ্রয় নিচ্ছেন, আবেগের কাছে পরাজয় মানতে রাজি নন কিছুতেই।

প্রচুর কাগজ-পত্র, একগাদা টুকিটাকি স্টেশনারি আর এটা-সেটা ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের ভিড় থেকে টোব্যাকো পাইপ আর তামাক ভর্তি পাউচটা খুঁজে নিয়ে আরেকবার রানার দিকে তাকালেন রাহাত খান। কিছু বলতে গিয়েও পারলেন না।

দুই

সময় নিয়ে পাইপে তামাক ভরছেন রাহাত খান। 'ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া গেছে তাকে তিনদিন হলো। দীঘায়, সৈকতে ভেসে এসেছে লাশটা।' সোহেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'বাকিটুকু তুমি বলো।'

'অনন্যকে টরচার করে মারা হয়েছে।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহেল। 'পুরানো পদ্ধতি–কথা বলতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত একজন লোককে পানির তলায় চেপে ধরে রাখা।'

'তার মানে মুখ না খুলে আত্মহত্যা করেছে অনন্য।' আবার তার তরুণ, তাজা চেহারাটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। অনুভব করল বুকের ভিতর একটা কষ্টকর ভার গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাসুদ ভাই বলতে অজ্ঞান ছিল ছেলেটা। ওর অনেক আচরণ প্র্যাকটিস করত সে–জানতে পেরে মাস তিনেক আগে খুব ধমকে ছিল রানা, বলেছিল: নিজেকে সবার চেয়ে আলাদা করে গড়ে নিতে পারাটাই কৃতিত্ব। 'ওদিকে কী করছিল অনন্য?'

'সারা দুনিয়ার ড্রাগ ব্যবসাতে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটেছে। একদিনে নয়, গত তিন বছর ধরে ঘটেছে ব্যাপারটা। এ বিষয়ে আমরা একটা গবেষণা চালিয়েছি। এই গবেষণার সূত্র ধরেই অনন্যকে পাঠানো হয়েছিল। কথা ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূল, পাকিস্তান আর আফগানিস্তান কাভার করবে সে। কিন্তু পশ্চিম উপকূলের হাজার মাইল পুবে, দীঘায় সে কী করছিল, এটা একটা রহস্যই।'

'আমাদের হাতে কোন ক্লু আছে?' জানতে চাইল রানা।

'আছে, তবে সেটাকে ক্লু না বলে ধাঁধা বলাই ভাল,' বলল সোহেল। 'দীঘা

থেকে একটা চিঠি পেয়েছি আমি। আমার ছদ্মনামে অনন্যই পাঠিয়ছিল।'

'কী লিখেছিল চিঠিতে?'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'কীসের চিঠি! মাত্র একটা শব্দ–রাত্রি।'

রানা বিড়বিড় করল: 'রাজীব ত্রিপাঠি?'

'কিছু বললি?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'বছর চার-পাঁচ আগে একজন তথাকথিত ভগবান বেশ খানিকটা হইচই ফেলে দিয়েছিল–ওই মেদিনীপুরেই, দীঘার কাছাকাছি, জায়গাটার নাম যেন কী···হ্যাঁ, মনে পড়েছে,রামনগর। তোর মনে নেই?'

মাথা নাড়ল সোহেল।

'তুমি বলো,' বললেন রাহাত খান।

'একজন ঋষি,' বলল রানা। 'শুধু পণ্ডিত নন, তপস্বীও। ধ্যান করতেন। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে এ-সব, স্যার। বোধহয় তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলেও দাবি করা হয়েছিল।'

সোহেল আর রাহাত খানের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'রিসার্চ সেলের রিপোর্ট পাবার পর গোটা ব্যাপারটাকে আমরা অন্য দৃষ্টিতে দেখছি,' বললেন বস্। 'আমরা অবশ্যই প্রতিশোধ নেব, তবে সেটা নিজস্ব পদ্ধতিতে। সোহেল, গো অ্যাহেড।'

'আয়,' বলে চেয়ার ছাড়ল সোহেল। 'আমাদের গবেষণার ফলাফলটা দেখাই তোকে।'

সোহেলের পিছু নিয়ে বসের ডেস্ককে পাশ কাটাল রানা। চেম্বারের পিছন দিকে এসে একটা পরদা সরাল সোহেল। ভিতরে ছোট একটা অন্ধকার অডিটরিয়াম দেখা যাচ্ছে। রানাকে বসতে বলে বোতাম টিপে প্রজেক্টর চালু করল সে।

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে রানার পাশের চেয়ারটায় বসলেন রাহাত খান।

সামনের দেওয়াল জোড়া মানচিত্রে দেখানো হয়েছে পশ্চিম গোলার্ধের ড্রাগ ট্র্যাফিক–বিপুল পরিমাণে হেরোইন কোত্থেকে এসে কোথায় ঢুকছে।

এরপর আমেরিকার মানচিত্র। বাহান্নটা রাজ্যে প্রভাবশালী মাফিয়া ড্রাগ ডিলারদের বর্তমান সংখ্যা একাত্তর। গত তিন বছরে ঠিক এই একাত্তর জন ড্রাগ ডিলারই খুন হয়েছে। সংখ্যাটা শুরু হয়েছে ২ থেকে। ১-এর পরিবর্তে লাল রঙের বিরাট একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা করবার পর সোহেল বলল, 'মূল ছবির এটা ছোট একটা অংশ মাত্র।'

বোতামে চাপ দিয়ে ক্লিক করল সোহেল। স্ক্রিনে দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পুব এশিয়ার মানচিত্র দেখা গেল। হংকং, তাইওয়ান, ম্যাকাও, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, বার্মা, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান আর আফগানিস্তান–এই ষোলোটা দেশকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম গ্রুপে আছে দশটা দেশ। এই দেশগুলোর মাফিয়া ড্রাগ ডিলারের সর্বমোট সংখ্যা দেড়শো, প্রায় সবাই সাবেক ডিলারদের সরিয়ে দিয়ে

নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছে।

মানচিত্রে এইসব দেশের ড্রাগ রুট বা ড্রাগ ট্র্যাফিক তীর চিহ্ন এঁকে দেখানো হয়েছে। বেশিরভাগ তীরই বিদ্ধ করেছে বাংলাদেশকে।

'উপকূল প্রায় অরক্ষিত হওয়ায় ট্র্যানজিট পয়েন্ট হিসাবে দক্ষিণ-পুব এশিয়ার মাফিয়া ড্রাগ ডিলাররা বাংলাদেশকে আদর্শ বলে মনে করে,' বলল সোহেল।

এশিয়ার দ্বিতীয় গ্রুপ তৈরি হয়েছে বাকি পাঁচটা দেশকে নিয়ে–নেপাল, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান আর আফগানিস্তান। এ-সব দেশের মাফিয়া ড্রাগ ডিলারদের সংখ্যা দুশোরও বেশি, গত তিন বছরে আন্ডারওয়ার্ল্ডে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মাথা তুলেছে তারা।

আবার ক্লিক করল সোহেল। স্ক্রিনে এবার ইউরোপকে দেখা যাচ্ছে। মানচিত্রে আঁকা রুটগুলোর সঙ্গে ট্রেন বা প্লেনের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো আফিম পাচারের চিহ্নিত পথ। পথটা ছুঁয়ে গেছে পালার্মো, নেইপলস, এথেন্স, বেলগ্রেড, বার্সেলোনা, মার্সেই আর মিউনিককে।

বোতাম টিপে মার্সেই শহরটাকে বড় করে দেখাল সোহেল: ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষে বিশাল এক শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল।

'মার্সেই হলো হেরোইন প্রসেস করার পুরানো সেন্টার। শহরটা কর্সিকানদের দখলে, স্বভাবতই ড্রাগ ব্যবসাটাও। পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার মত এখানেও, বাইরের রহস্যময় একটা শক্তির সাহায্য নিয়ে, পুরানো ব্যবসায়ীদের সরিয়ে নতুন ব্যবসায়ীরা উঠে আসবার চেষ্টা করে। কিন্তু মার্সেইতে তারা সুবিধে করতে পারেনি। কর্সিকান ড্রাগ ডিলারদের খুন করা সম্ভব হয়নি। হামলা ঠেকিয়ে দিয়ে দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে তারা।

'কিন্তু ওখানকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ব্যবসাটা উঠে এসেছে এখানে–' মার্সেই-এর বদলে স্ক্রিনে চলে এল জার্মানির মিউনিক। 'এবার মিউনিকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে হয়।

'মিউনিকে আছে কয়েক হাজার বিদেশী কারখানা শ্রমিক, বেশির ভাগ আফগান আর তুরকি। আফিম তাদের মাধ্যমেই ঢোকে ওখানে। মার্সেই-এর ব্যবসা মিউনিকে চলে আসার পর আন্ডারওয়ার্ল্ডে বিরাট একটা আলোড়ন উঠল–সবাই টের পেল, অন্যান্য জায়গার মত এখানেও কিলিং শুরু হতে যাচ্ছে, পুরানো ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দিয়ে উঠে আসবে নতুন ড্রাগ লর্ডরা।

'কিন্তু সেটা ঘটল না। ঘটল না হঠাৎ করে জার্মান পুলিশের নারকোটিক বিরোধী তৎপরতার কারণে। বহু বছর পর এই প্রথম হেরোইন ট্র্যাফিকের প্যাটার্ন হয়ে উঠল বহুমুখী স্রোতের মত।

'একদিকে পুরানো মাফিয়া ডনরা নিজেদের ক্ষমতা আর প্রভাব ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে; আরেকদিকে, অল্প যে দু'একজন নতুন উঠে এসেছে, তারা পুরানো কনট্যাক্টদের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। তাই সবাই এখন নতুন কনট্যাক্টদের তৈরি নতুন রুট পাবার আশায় অপেক্ষা করছে। আর এখানেই আমাদের সুযোগ…'

'বুঝতে পারছি আসলে তুই কী বলতে চাস,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'সমস্যাটাকে বাইরে থেকে নাড়াচাড়া না করে মাফিয়ার সামনে নিজেকে আমি একজন ড্রাগ ডিলার হিসেবে দাঁড় করাব, যার কাছে নিরাপদ একটা ড্রাগ রুট আছে?'

'দ্যাটস রাইট, তুমি ঠিক ধরেছ,' এই প্রথম মুখ খুললেন রাহাত খান। 'অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ঢুকবে না তুমি, মাফিয়ার একজন প্রিয় পার্টনার হিসেবে ওদের আমন্ত্রণ আদায় করতে হবে তোমাকে। তবে আমি পরে ব্রিফ করছি, তার আগে সোহেলকে শেষ করতে দাও।'

'আমাদের রিসার্চের সারমর্ম হলোঃ দুনিয়ার ড্রাগ ব্যবসা একজনের হাতে চলে গেছে,' সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল সোহেল। 'আমরা জানতে পেরেছি, তার ঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রে। একাত্তর জনের একজন সে, আমরা বলছি ১ নম্বর–আরেক গড ফাদার। না, তার পরিচয় জানা যায়নি।'

'ওই লোকের সংগঠনটা কেমন বা ঠিক কোথায়, তাও আমরা জানি না, তবে জানি নতুন মাফিয়া ড্রাগ লর্ডরা তার সাহায্য পেয়েই উঠে এসেছে। এ-ও জানি যে সবাই এই সম্রাটকে নিয়মিত লাভের বখরা দেয়।

'আরেকটা কথা, রানা। টাকার হিসেবে ব্যবসাটা মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত। তুরস্কের কুর্দি এলাকায় একজন কৃষক দশ কিলো বা বিশ পাউন্ড আফিম ১৬৫০ লিরায় বিক্রি করে, এটা ১১০ ডলারের সমান। এই আফিমই প্রসেসিঙের মাধ্যমে হেরোইনে রূপান্তরিত হয়ে আমেরিকার রাস্তায় পৌঁছানোর পর মূল্যটা বেড়ে দাঁড়ায়ঃ প্রায় এক কোটি ডলার।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'ব্যস, মোটামুটি এই।'

প্রজেক্টর অফ করে দিয়ে অডিটরিয়াম থেকে বসের মূল চেম্বারে ফিরে এল ওরা। নিশ্চয়ই আগে থেকে বলা ছিল, দশ সেকেন্ডের মধ্যে নক করে ভিতরে ঢুকল বিসিআই টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের চিফ প্রফেসর শামশের আলী।

'আসুন, বসুন,' বলে তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন রাহাত খান, তারপর রানার দিকে তাকালেন। 'তুমি কাজ শুরু করবে প্রথমে ভারত, তারপর তুরস্ক থেকে।'

'ও, একজন তুরকি সেজে যাচ্ছি আমি, সার।'

'হ্যাঁ। কারণ তুরস্ক হলো ইউরোপিয়ান আফিমের ডিপো। কর্সিকানরাও ওখান থেকে তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ করে। তা ছাড়া, তুরস্কের আফিম মানের দিক থেকেও দুনিয়ার সেরা।'

বসের বক্তব্য মন দিয়ে শুনছে রানা।

পাইপটা নতুন করে ধরালেন রাহাত খান। চোখ তুলে রানাকে একবার দেখে নিলেন। 'মাফিয়া যে-কোন তুরকির কথা শুনবে,' বললেন তিনি। 'শুধু কুর্দি এলাকায় নয়, তুরস্কের প্রায় সব জায়গায় আফিমের চাষ হচ্ছে। বর্তমান সাপ্লাইয়ারদের সঙ্গে না জড়ালেও পারো তুমি।'

প্রফেসর শামশের আলীর দিকে তাকাল রানা। 'কী রকম মেকআপ লাগবে, প্রফেসর?'

'খুব বেশি নয়। আপনার বাড়ি যদি বন্দর নগরী ইজমিরে হয়, ওখানে ফর্সা

লোকেদের ভিড়ে প্রচুর শ্যামলা লোকজনও দেখতে পাওয়া যায়। কুর্দি ছাড়াও বেশ কিছু উপজাতির মানুষ অনেকটা আমাদের মতই দেখতে। হাইট–ঠিক আছে।'

'কিন্তু নাক?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ, আপনার নাকের ব্রিজটা একটু গড়ে নিতে হবে। আর…হেয়ার স্টাইল বদলে দেব…গালের রেখাগুলো আরেকটু স্পষ্ট করব। ব্যস!'

'ইজমিরের বাচনভঙ্গি শেখার জন্যে কয়েকটা টেপ যোগাড় করা হয়েছে,' জানাল সোহেল।

'সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে,' বললেন রাহাত খান। 'তবে ছোট কয়েকটা সমস্যার এখনও কোন সমাধান পাওয়া যায়নি।'

আগ্রহ নিয়ে বসের দিকে তাকাল রানা; ভাবটা যেন, কোন সমস্যাকেই বড় বলে মনে করে না।

'তোমার কাছে প্রচুর হেরোইন থাকলে মাফিয়াকে বোঝানো সহজ হবে পার্টনার হিসেবে তুমি অত্যন্ত লোভনীয়,' বললেন রাহাত খান।

'কিন্তু, সার, এই জিনিস আমি পাব কোথায়? আপনি কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না?'

'আহ, আমি কোত্থেকে পাব! তবে আমি জানি, তুমি চাইলে কেউ একজন প্রচুর আফিম দিতে পারবে তোমাকে।'

'ডেলিভারি, সার।'

'কায়রো,' বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন রাহাত খান। 'মাফিয়ার কাছে তোমার প্রমাণ করতে হবে তুরস্ক থেকে নিউ ইয়র্কে হেরোইন নিয়ে যাবার ফুলপ্রুফ একটা সিস্টেম জানা আছে তোমার। ফুলপ্রুফ মানে ফুলপ্রুফ। যদি কাস্টমস ধরে, তুমি জেলে যাবে। মাফিয়া যদি সন্দেহ করে এটা একটা সেট আপ–কাস্টমস তোমার শিপমেন্ট ধরার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে না–তা হলে ওরা তোমাকে খুন করবে। দুটোর মধ্যে যেটাই ঘটুক তোমার অপারেশন ভেস্তে যাবে।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার, সার,' বলল রানা, চিন্তিত। 'হেরোইন পাচার করার জন্যে কর্সিকানরা কফিন থেকে শুরু করে গাড়ির গদি পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখেনি। আমরা কি, সার, এমন কিছু ভেবেছি যা ওদের মাথায় খেলেনি?'

'না, রানা,' বললেন বস্, 'আমরা কিছুই ভাবিনি। এই ব্যাপারটা তোমার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছে। তোমার হাতে এক হপ্তা সময় আছে, এর মধ্যে উপায় নিশ্চয়ই কিছু একটা পেয়ে যাবে।'

'মাত্র এক হপ্তা, সার?' চেয়ার ছাড়বার সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

রাহাত খান অন্যমনস্ক, বোধহয় রানার কথা শুনতেই পাননি।

কামরা থেক বেরিয়ে যাওয়ার সময় রানার পিঠ চাপড়ে দিল সোহেল, ফিসফিস করে বলল, 'এটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগা কোন মানে হয় না। তোর যা মাথা, বিদ্যুৎ চমকের মত কিছু একটা পেয়ে যাবি। বরাবর যেমন পাস আর কী।'

সোহেলের এই ক্ষীণ বিদ্রূপের জবাবে চুপ করে থাকল রানা। মাথাটা ভার হয়ে আছে ওর, মনে হচ্ছে গভীর পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাল ও, মনে পড়ে গেছে বসকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

'এক মিনিট, রানা!' চোখাচোখি হতেই ডাকলেন রানাকে।

পিছিয়ে পড়ল রানা, ইতিমধ্যে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সোহেল।

রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন রাহাত খান আগে কক্ষনো যা করেননি, আজ তিনি তাই করলেন। একটু ঝুঁকে রানার হাত দুটো ধরলেন, তুলে আনলেন নিজের বুকের কাছে। 'এখানটা পুড়ছে, রানা।' নিচু কণ্ঠে বললেন। 'তুমি দেখো, অনন্যর আত্মা যেন শান্তি পায়।'

সোহেলকে বিদায় জানিয়ে প্রফেসর শামশের আলীর সঙ্গে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে চলে এল রানা। এখানে ওর নাক, চুল ইত্যাদির মাপ নেওয়া হবে। কিছু ফটোও তোলা হবে।

'ব্যাপারটা সত্যি ভারী কঠিন,' কাজের ফাঁকে এক সময় বললেন প্রফেসর আলী। 'ভবিষ্যৎ পার্টনারকে প্রভাবিত করার জন্য আপনাকে বেশ কিছুটা হেরোইন পাচার করতে হবে। গত পনেরো দিন ধরে আমি আর আমার লোকজন কয়েকশো পদ্ধতির কথা ভেবেছি, কিন্তু পরে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেছে, এ-সব পদ্ধতি অনেক আগেই ব্যবহার করা হয়ে গেছে, কিংবা কাস্টমস্ জানে ব্যবহার করা হতে পারে।

'গাড়ির ইঞ্জিন, ফলস্ প্যানেল, এমনকী জাপানি রেডিও বা ডেকসেট পর্যন্ত। হয় ট্রেনিং পাওয়া কুকুর গন্ধ শুঁকে হেরোইন বের করে ফেলে, নয়তো কাস্টমসের এক্স-রেতে ধরা পড়ে যায়।

'মেক্সিকানরা কি করেছিল জানেন না? ওরা গরু-ছাগল আর ভেড়ার পেট কেটে ভেতরে হেরোইন ঢোকায়, তারপর পেট সেলাই করে ওগুলোকে সীমান্ত দিয়ে পার করায়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কাস্টমস ব্যাপারটা ধরে ফেলে।

'আমদানি করা ফল পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা করা হয় টিনজাত খাবার। বোমার ভয়ে হাতে-থাকা লাগেজও তন্নতন্ন করে সার্চ করে।'

'আমি যদি আমার পেটে করে নিয়ে যাই?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

প্রফেসর আলী চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আরেকটা প্রশ্ন করল রানা। 'প্লেনের ভিতর, সিটের তলায় লুকিয়ে রাখতেই বা অসুবিধে কী?'

'এয়ারলাইন স্যানিটেশন ওয়ার্কারের সহযোগিতা দরকার হবে, আরোহীরা নেমে যাবার পর প্লেনটা যে পরিষ্কার করে। আপনার রেখে যাওয়া হেরোইন সে তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাকুম ক্লিনারে ভরে নেবে।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' রানা আশাবাদী হয়ে উঠছে।

'কিন্তু মুশকিল হলো, এটাও পুরানো। আপনি বোধহয় জানেন, মার্সেই আর মিউনিকের সাপ্লাইয়ারদের ল্যাবরেটরি আছে, পাচারের নিরাপদ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যে দুনিয়ার সেরা মেধাবি লোকদের অবিশ্বাস্য মোটা টাকা বেতন দিচ্ছে বছরের পর বছর। স্বভাবতই আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে তারা।'

তখনও বিড় বিড় করছেন প্রফেসর আলী, বিদায় নিয়ে চলে এল রানা।

*

পরবর্তী পাঁচদিন তুরকি ভাষাটা ঝালিয়ে নিল রানা, আর ওর নতুন তুরকি পরিচয় মুখস্থ করল, সেই সঙ্গে ভাবতে লাগল হেরোইনের বড়সড় একটা চালান কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া যায়।

বিসিআই টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে ওর সঙ্গে, তবে রানার মত তারাও 'ফুলপ্রুফ' কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। রোলস রয়েসের এক মাইল লম্বা ওয়্যারিঙে হেরোইন লুকিয়ে রাখবার ব্যাপারটা আইডিয়া হিসাবে একজন রিসার্চারের কাছে চমকপ্রদ বলে মনে হতে পারে, তবে এ-ধরনের কোন প্ল্যানে নিজের প্রাণ বাজি ধরতে রাজি নয় রানা। তা ছাড়া, রানার সমস্যা বড় একটা চালান নিয়ে যাওয়া, নামমাত্র নমুনা নয়।

'দুটো অ্যাসপিরিন আর কড়া এক কাপ কফি খাওয়াতে পারো?' সেদিন অফিসে ফিরে প্রাইভেট সেক্রেটারি কাকলিকে বলল রানা।

'মাসুদ ভাই, তোমার বুঝি মাথা ধরেছে?'

'হ্যাঁ, ধরেছে, তবে যদি ভেবে থাকো তুমি টিপে দিলে সেরে যাবে তা হলে ভুল করবে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'যা বলছি করো, কফি আর পিল দাও।'

'আমি আবার কখন তোমার মাথা টিপে দিতে চাইলাম,' বিড় বিড় করতে করতে পাশের কামরায় চলে গেল কাকলি।

ডেস্কের উপর বিরাট একটা বিদেশী লেজার রয়েছে, কদিন হলো পড়ছে রানা। বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যত রকমের পণ্য আমদানি করা হয়, তার উপর একটা সার্ভে এটা।

'কী সাংঘাতিক, তুমি আবার ওই ভারী বইটা খুলে বসেছ?' ফিরে এসে তিরস্কারের সুরে বলল কাকলি, রানা যেন ছোট্ট একটা দুষ্ট বালক।

'ভারী শুধু বইটা নয়, পাতাগুলোও। তুমি হয়তো আমার হয়ে ওগুলো উল্টে দিতে চাইবে।'

'রক্ষে করো!' ট্রেটা ডেস্কে নামিয়ে সভয়ে পিছিয়ে গেল কাকলি। আবার চোখের সামনে থেকে সরে গেল সে।

ট্যাবলেট আর কফি খেয়ে লেজারটার ভিতর ডুব দিল রানা, এবার নিয়ে গত ক'দিনে পাঁচবার। সময় বয়ে চলেছে…বয়ে চলেছে…হঠাৎ কার্পেটে নরম পায়ের শব্দ একটু বিঘ্ন সৃষ্টি করল মনোসংযোগে। তারপর আবার রানা মগ্ন হয়ে পড়ল। খানিক পর ফের বাধা।

এই শব্দটা পরিচিত। একটা চকলেটের মোড়ক খোলা হচ্ছে। কী চকলেট কে জানে, কাকলির কোন এক ভাই সিঙ্গাপুর না কোথা থেকে যেন পাঠিয়েছে। মোড়ক খুলবার সময় এরকম মুড়মুড় আওয়াজ হয়। আজ তিনদিন ধরে শুধু ওই চকলেট খেয়েই পেট ভরাচ্ছে মেয়েটা। এত সুন্দর ফিগারটাই না নষ্ট করে ফেলে।

আবার লেজারে ডুব দিতে যাবে রানা, কিন্তু পারা গেল না। কাকলির মুখের ভিতরটা পানিতে ভরে গেছে, ঘন ঘন ঢোক গিলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাকে। তারপর গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিল।

রানা পুরোপুরি সচেতন হওয়ার পর আবিষ্কার করল, কাকলি ঠিক ওর

চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোপুরি সচেতন হওয়ার কারণটা হলো, ওর মুখে একটা চকোলেট গুঁজে দিয়ে কাকলি রানার মাথার চুলে বিলি কাটছে। তারপর ধীরে ধীরে কপালটা টিপে দিতে শুরু করল। 'ভাল লাগছে, মাসুদ ভাই?'

চকলেট চুষতে চুষতে ভাবল রানা, ভালই তো!

অফিস আওয়ারের শেষে সোহেল রানাকে নিতে এল, জানাল বস ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। সোহেলের ভাবটা এমন, রানা যেন কোন গুরুতর অন্যায় করেছে, বস ওকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ডাকছেন।

'আর আটচল্লিশ ঘণ্টা পর প্লেনে উঠছ তুমি, রানা,' চেম্বারে ঢুকে বসতে না বসতে বললেন রাহাত খান। 'টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট বা তুমি কোন সিস্টেম খুঁজে পেয়েছ?'

'পেয়েছি, সার।' বসের ডেস্কের উপর একটা তালিকা রাখল রানা। 'এগুলো দরকার হবে আমার।'

কাগজটায় দ্রুত চোখ বুলালেন রাহাত খান, তারপর মন দিয়ে দু'বার পড়লেন ওটা, শেষবার প্রচুর সময় নিয়ে। 'আরে, এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে হচ্ছে! পর্তুগিজ এক্সপোর্টারকে একটা অর্ডার, একটা রেলওয়ে-কার লিজ, এক দক্ষিণ আমেরিকান আর এক জার্মান কোম্পানির মালিকানা? ব্যস? এত সহজ?'

'আমাদের টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট আফিম লুকানোর কথা বলেছিল,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'আইডিয়া বা অ্যাপ্রোচটাই আমার পছন্দ হয়নি, সার।'

'তা তো আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি। তোমার এটা ফুলপ্রুফ, এতটাই যে স্রেফ একটা জোক বলে মনে হচ্ছে। কংগ্রাচুলেশন্স, মাই বয়।'

'না, সার, কৃতিত্বটা আসলে পুরোপুরি আমার প্রাপ্য নয়,' বলল রানা। 'আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে কাকলি।'

চোখ সরু করে ওর দিকে তাকাল সোহেল।

সেটা লক্ষ করে মনে মনে হাসল রানা, ভাবল–তোর মনটা সন্দেহপরায়ণ, নোংরা, দোস্ত!

তিন

রোদ লেগে চিকচিক করছে সাগরের পানি। সৈকতে যতদূর দৃষ্টি যায়, সুইমিং ট্রাঙ্ক ও বিকিনি পরা যুবক-যুবতী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

আজ দশদিন হলো ঢাকা ছেড়েছে রানা। প্রথম পাঁচ দিন রানা ভারতে ছিল, তুরস্কে ছিল তিনদিন, একদিন ছিল মিশরে, আজ সকালে লেবাননে এসে রাজধানী বৈরুতের ফাইভ স্টার হোটেল হিলটনে উঠেছে। কায়রোয় রানা গিয়েছিল বান্ধবী ফারাহ্ জিন্নাতের বাবা, যোগাযোগ ও পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মিস্টার শাহ নওয়াজের কাছে বিশেষ একটা অনুরোধ নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায়, রামনগর থানার দারোগাবাবু সদাশয় গুপ্ত

সদাশয় ব্যক্তি, পুরানো অফিসার, ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিতে পেরেছেন ওকে।

ঘটনাচক্রে ওখানে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে পুরানো বন্ধু নিক হিউবার্টের। হিউবার্ট মার্কিন সরকারের অ্যান্টি নারকোটিক স্কোয়াডের একজন এজেন্ট, সে-ও একটা কেসের তদন্ত নিয়ে মেদিনীপুরে এসেছে। দীর্ঘ বৈঠক আর কথা কাটাকাটির পর একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে দুই বন্ধু।

বিসিআই টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট রানার মুখ আর মাথার উপর সামান্যই হাত লাগিয়েছে, তবে তাতে পরিবর্তন ঘটেছে বিরাট। নাকের সিলিকন ব্রিজ চেহারায় বাজপাখিসুলভ তীক্ষ্ণ একটা ভাব এনে দিয়েছে। এখন আর মাসুদ রানা নয় ও, ওর বর্তমান পরিচয়–ফাহিম আরসালান। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, তবে খুব কমই টান দিতে দেখা যাচ্ছে। পরে আছে সাদা আলখেল্লা আর স্যান্ডেল। চোখে-মুখে বেপরোয়া, প্রায় মারমুখো একটা ভাব ধরে রেখে বালির উপর দিয়ে হাঁটছে। যে-সব মেয়েরা ধনী পুরুষ শিকার করতে সৈকতে এসেছে, তারা ওর ধারেকাছেও ঘেঁষবে না।

অর্ধনগ্ন লেবানিজ আর ইউরোপিয়ান মেয়েরা বিচ বল খেলছে। তাদের মধ্যে অনেকেই ওর দিকে দ্বিতীয়, এমনকী তৃতীয়বারও তাকাল।

ইচ্ছে করেই কবজিতে প্ল্যাটিনাম রোলেক্স আর আঙুলে ঢাউস একটা হিরের আঙটি পরেছে রানা–এগুলো গুণ্ডা আর অপরাধীদের ট্রেডমার্কই বলা যায়।

সামনের দিকটায়, সৈকতের কিনারা ঘেঁষে, লাল আর সাদা রঙের ডোরাকাটা এক সারি তাঁবু দেখা যাচ্ছে। ওদিকটায় আন্তর্জাতিক মেহমানরা নিভৃতে ঝিমোয়; উত্তেজনাকর, বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছে ভূমধ্যসাগরে ডুব দিয়ে শান্তিময় সময় কাটানোর জন্য। দুটো মেয়ে, যথেষ্ট মেকআপ নিয়েছে, স্তন তেমন আকর্ষণীয় নয়, তবু টপলেস; থমকে দাঁড়িয়ে অকারণ রাগ আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকাল ওর দিকে। ওর মধ্যে কী দেখল কে জানে, প্রশ্নটা করা মাত্র এক ছুটে যে যার বয়ফ্রেন্ডের কাছে ফিরে গেল–নিজেদের তাঁবুর সামনে।

রানা অবাঞ্ছিত আগন্তুক, গুণ্ডা–ওদের দৃষ্টি সে কথাই বলছে।

'তুমি সত্যি যদি মিস্টার আলবার্ট ডি' মোনা কার্টিসকে চাও,' দু'জনের মধ্যে রোগা মেয়েটা বলল, হাত তুলে দূরের একটা তাঁবু দেখাচ্ছে, 'তা হলে সোজা ওদিকে যেতে হবে।'

'ধন্যবাদ।' তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ওর নতুন চেহারায় যা থাকবার তা তো আছেই, আরও আছে রক্ত পানি করা দৃষ্টি–মেয়ে দুটোর কাঁধের সূক্ষ্ম লোম দাঁড়িয়ে গেল, তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে নিজেদের উন্মুক্ত বুক ঢাকল তারা। এতক্ষণে সিগারেট ফেলে দিয়ে স্যান্ডেল দিয়ে পিষল রানা, তারপর দেখিয়ে দেওয়া তাঁবুটার দিকে এগোল।

রানার যে-ধরনের কাজ, আলবার্ট ডি' মোনা কার্টিসের মত একজন লোকই দরকার ওর। লোকটা ইটালিয়ান, তিন পুরুষ ধরে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে বসবাস করছে, দুটো রিফিউজ-ডিসপোজাল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট, রিয়ালএস্টেট ডিলার, রেসট্র্যাক শেয়ারহোল্ডার, চ্যারিটি চেয়ারম্যান। ডি' মোনা নিউ ইয়র্কের

সবচেয়ে বড় দুই মাফিয়া পরিবারের একটার প্রধানও বটে। অর্থাৎ সে একজন ডন।

ডি' মোনা বৈরুতে এসেছে অল্প কদিনের ছুটি নিয়ে। তবে তার ছুটিটাকে ব্যবসায়িক সফরে পরিণত করতে যাচ্ছে রানা।

অনুভব করল, ওর পিছন থেকে দু'জন লোক এগিয়ে আসছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, তাদের পিস্তল দুটো ওর পিঠে তাক করা। কাজেই দৌড় দেওয়ার কোন মানে হয় না। দাঁড়াল রানা, আরেকটা সিগারেট ধরাল। অপেক্ষা করে দেখা যাক।

সাদা সুট পরা মাসল্‌ম্যান। ট্রাউজারের পকেটে পিস্তল, হাত দিয়ে বাঁট ধরে আছে। দু'জনের চোখেই গাঢ় চশমা। সাদা সুট যেন দাঁতের সঙ্গে ম্যাচ করা।

'এই, থামো! তুমি কাউকে খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল দু'জনের মধ্যে যে লোকটা বেশি তাগড়া। মাথায় বুদ্ধি বোধহয় একটু কম, তা না হলে দাঁড়ানো কাউকে থামতে বলবে কেন?

রানা জবাব দিল, 'ব্যবসা নিয়ে কথা আছে।'

'কার সঙ্গে?'

'যে লোকটা ওই তাঁবুতে আছে। দাঁড়াও, আমার কলিং কার্ড দিচ্ছি। এই দেখো, হাতটা খুব ধীরেই নাড়ছি।'

আলখেল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা প্ল্যাস্টিসিন ব্যাগে ভরা সাদা পাউডার বের করল রানা। ওজন করলে চার আউন্সের বেশি হবে না, এই কলিং কার্ডের বাজারদর এক লক্ষ মার্কিন ডলার।

বডিগার্ডদের মধ্যে হাতিটাই দাঁত বের করে হাসল। 'যদি ভেবে থাকো ওই তাঁবুর বসকে এটা দিয়ে ফাঁসাবে, আমি বলব তুমি সুস্থ নও। উনি, বস, বৈরুতে আসার আগেই এখানকার সব পুলিশকে কিনে নিয়েছেন।'

'সেটা জানি বলেই তো কার্ডটা আমি সৈকতে এনেছি। এই কার্ড তুমি শুধু পৌঁছে দাও। সে যদি চায়, এটা ফেলে দিতে পারে। শুধু বলবে, আমার ওপর একবার যেন চোখ বুলায়। পরে যখন দেখা করব, আমি চাই সে যেন তখন আমাকে চিনতে পারে।'

দেহরক্ষীরা রানার বক্তব্য বিবেচনা করে দেখছে। ওর শুরুটায় পেশাদারি একটা ভঙ্গি আছে, তা ছাড়া তাদের কাজ অনেক সহজও করে দিচ্ছে ও।

'তোমার নাম কী?'

'ফাহিম আরসালান। তুরকি।'

'শোনো—ছুটি কাটাতে এসেছেন, তাই মিস্টার ডি' মোনা চান না কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক। তবু আমি দেখছি কী করা যায়।'

মৌন দেহরক্ষী রানার সঙ্গে থাকল। প্রথমজন ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভিতর।

পাঁচ মিনিট পর তাঁবুর ফ্ল্যাপ তুলে একটা মেয়ে বেরুল। কপালে মস্ত টিপ, পরনে শাড়ি, গায়ের রঙ আধ-ফরসা। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে এরকম মেয়ে দেখেছে রানা। সৈকতের উপর দিয়ে হেঁটে পানির কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

এক মিনিট পর বেরুল আলবার্ট ডি' মোনা কার্টিস। লোকটা লম্বা। শরীরটা যেন চওড়া কংক্রিটের পাঁচিল। মাথায় সোনালি চুল। চারপাশে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে

তাকাল, যেন বুঝতে চাইছে সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি। তারপর অলস ভঙ্গিতে হাঁটল, থামল সাগরের কিনারায় পৌঁছে মেয়েটার পাশে।

তবে রানাকে দেখেছে সে। মেমোরি ব্যাঙ্কে ওর মুখটা রেকর্ডও হয়ে গেছে। ঘুরে ওই জায়গা ত্যাগ করল রানা।

যোগাযোগ ঘটেছে।

নিউ ইয়র্ক মাফিয়ার ওই বিশেষ ডনও হিলটনে উঠেছে–রানা এগারোতলায়, সে বাইশতলায়। দিনের বাকি সময়টা হোটেল ছেড়ে কোথাও বেরোয়নি রানা। এ তো সহজ হিসাব, ওর দেওয়া হেরোইনের মান পরীক্ষা করতে ডি' মোনার খানিকটা সময় লাগবে। ওর স্যুইটের টিভিতে ডিশের লাইন আছে, খেলা দেখে সময় কাটানো গেল।

রাত এগারোটার দিকে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল রানা। একটার সময় নক হলো সিটিংরুমের দরজায়। বেডরুম থেকে এসে দরজা খুলল রানা।

পেটে ডেবে যাওয়া পিস্তলের মাজল ঠেলে একটা শো-কেসের গায়ে নিয়ে এসে ফেলল ওকে। পিস্তলটা প্রকাণ্ড সেই দেহরক্ষীর হাতে। খালি হাতটা দিয়ে আলো জ্বালল সে। সাপের মত পুরোপুরি ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে।

দ্বিতীয় দেহরক্ষী যেখানে যা পাচ্ছে সব খুলে দেখছে। ব্যাগগুলোয় কিছু পেল না। পেল না কার্পেটের তলাতেও। খামোখা ওয়ারড্রোব খালি করে ফেলল। স্বভাবতই থ্রিটু বেরেটাটা পেল সে, নাইট স্ট্যান্ডের তলায় টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল রানা। একটা আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া না গেলে সেটা অদ্ভুত বলে মনে হত লোকটার। সবশেষে, সার্চ করে সন্তুষ্ট হওয়ার পর, রানার পেট থেকে পিস্তলটা সরানো হলো। প্রকাণ্ডদেহীর ইঙ্গিত পেয়ে করিডর থেকে স্যুইটে ঢুকল ডি' মোনা, ঢুকে পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

হেরোইন ভরা ব্যাগটা একটা সোফার উপর ছুঁড়ে দিল সে। 'তুমি নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

লোকটার আচরণে সতেজ একটা ভাব আছে, অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নেই। কারণটা রানা আন্দাজ করতে পারছে। ব্যস্ত মানুষকে কোন কাজ করতে না দিয়ে শুধু আরাম করতে বললে তাকে আসলে বিপদে ফেলে দেওয়া হয়। স্ব-আরোপিত সেরকম একটা বিপদের মধ্যেই ছিল ডি' মোনা, তারপর রানার উপর চড়াও হওয়ার সুযোগ পেয়ে ছুটির একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তার নীল চোখ মাপছে রানাকে, যেন লাশ বানাবে বা কফিনে ভরবে। দেখতে চাইছে গভীর রাতে ঘুম ভাঙালে কী রকম ঘামে সামনের লোকটা।

'আমার ধারণা তুমিও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও,' জবাবে বলল রানা, ওর ইংরেজিতে তুরকির টান থাকল। 'আমি সবচেয়ে উন্নত মানের টার্কিশ হেরোইনের কথা বলছি। বলছি ওগুলোর বড় একটা চালান যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার কথা।'

'তাই?' সামান্য আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ডি' মোনা। 'কার জন্যে?'

লোকটা রানাকে একজন মেসেঞ্জার ধরে নিয়েছে, কিংবা হয়তো ভাবছে কোন সাপ্লাইয়ারকে ডাবল-ক্রস করছে ও।

নাইট স্ট্যান্ডে স্কচের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস রয়েছে। এক আউন্স

করে হুইস্কি ঢেলে একটা গ্লাস ডি' মোনাকে সাধল রানা। গ্লাসটা নিল সে, তবে চুমুক দিল রানার পরে। 'আমার জন্যে, ডি' মোনা, শুধু আমার জন্যে।'

'আচ্ছা?' এক লাখ ডলার মূল্যের কলিং কার্ডের কথা ভাবছে ডি' মোনা। 'বড় চালান? জানতে পারি, কত বড় চালানের কথা বলছ তুমি?'

'সে অনেক, মিস্টার ডি' মোনা। একশো কেজি আফিম থেকে যতটা হেরোইন তৈরি হয়। হিসেবটা নিশ্চয়ই তুমি জানো।' মনে মনে লোকটার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো রানা। তার গ্লাস থেকে এক ফোঁটা হুইস্কিও ছলকায়নি। শুধু চোখ দুটোর পাতা কয়েক সেন্টিমিটার চওড়া হলো।

'এ-একশো কেজি আফিম থেকে?'

'ভুল শোনোনি, মিস্টার। এটা প্রথম শিপমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করবে।'

'প্রথম শিপমেন্ট?' গ্লাসে তাড়াহুড়ো করে একটা চুমুক দিল ডি' মোনা। তারপর নরম শব্দে একটু হাসল। 'তুমি খুব বড় বড় বোলচাল মারছ, মিস্টার আরসালান। কিছু যদি মনে না করো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কি না। আজ আমি এখানে-সেখানে বেশ কয়েকজনকে ফোন করলাম। কেউ তোমার নামই শোনেনি।'

'শুনবে না তো, তোমার রেগুলার সাপ্লাইয়াররা কেউই শুনবে না।'

'ঠিক তাই।'

'গুড,' বলল রানা। 'ব্যাপারটাকে এভাবেই থাকতে দাও।'

'সম্ভব নয়,' ডি' মোনা যেন গুলি ছুঁড়ল। 'কারও সঙ্গে কোন কাজ করার আগে প্রথমেই আমরা রেফারেন্স দাবি করি।'

'কলিং কার্ডটাই আমার রেফারেন্স।'

'আরও বলি,' বলে চলেছে ডি' মোনা, 'একবারের ডেলিভারিতে ওই পরিমাণ হেরোইন বহন করা অসম্ভব। কেউ কোনদিন পারেনি।'

'আমি পারব। দ্বিতীয় শিপমেন্ট হয়তো প্রথমটার দ্বিগুণ হবে।'

কথা না বলে রানাকে আরও ভাল করে দেখছে ডি' মোনা।

নীরবতা ভেঙে রানাই আবার কথা বলল, 'ব্যাপারটা তোমাকে আরও পরিষ্কার করে বলি, যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। তোমার দৃষ্টিতে কী সম্ভব আর কী অসম্ভব, এর কোন গুরুত্ব নেই–চালানটা নিউ ইয়র্কে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কেনার সুযোগটা সবার আগে তুমিই পাচ্ছ। তোমার যদি আগ্রহ না থাকে, নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আমি স্রেফ আরেক পরিবারের কাছে যাব।'

'কে বলল আমি আগ্রহী নই! অবশ্যই আমি আগ্রহী।'

'কিন্তু তুমি ভাবছ–এত ভাল ভাল নয়, ঠিক? ভাবছ, এই তুরকি ব্যাটার প্রস্তাব সত্যি হলে সূর্যও কাল পশ্চিমে উঠবে। আমি বরং তোমাকে আসল ব্যাপারটা খুলে বলি।

'আফিম কেনা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়–তুরস্কের পাহাড়ী এলাকা চেনা থাকলে যে-কেউ তা কিনতে পারবে। যে-সব সাপ্লাইয়ারকে ফোন করেছ তারা আমাকে চেনে না? আরে, আমার প্ল্যান প্রতিদ্বন্দ্বীদের জানিয়ে দেয়াটা কী

বুদ্ধিমানের কাজ?' হাসল রানা। মাথা নাড়ল। 'না। আসল কথা হলো আমার কাছে ডেলিভারি দেয়ার কোন সিস্টেম আদৌ আছে কি নেই। স্বীকার করছি, আমার মুখের কথা বিশ্বাস করাটা তোমার জন্যে বোকামি হয়ে যাবে। আবার, পাগল না হওয়া পর্যন্ত আমার সিস্টেমটা আগেভাগে তোমাকে আমি জানাব না। তবে নিজস্ব একটা সিস্টেম সত্যিই আমার আছে। ফুলপ্রুফ।'

দু'ঢোকে খালি করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ডি' মোনা। 'সিস্টেম সবারই একটা থাকে, আরসালান।' সোফা ছেড়ে ইঙ্গিতে দরজার দিকটা দেখাল দেহরক্ষীদের। 'তো, যেমন বললাম, তুমি আমাকে আগ্রহী করতে পেরেছ। যদি কখনও নিউ ইয়র্কে পৌঁছাতে পারো, দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

'না, তা বোধহয় করব না।' তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল রানা। 'কারণ ততক্ষণে তোমার প্রতি আমার কোন আগ্রহ থাকবে না। গুড নাইট।'

রানা একা হয়ে গেল।

ওর হুমকিটা স্রেফ বাগাড়ম্বর নয়, ডি' মোনা তা জানেও, কারণ মাফিয়া পরিবারের প্রধান হিসাবে তার কাজই হলো প্রতিদ্বন্দ্বীর গুরুত্ব অনুধাবন করা। ড্রাগের টাকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল স্রোতের আকার নিলে সেটা মার্কিন মাফিয়া জগতে ভূমিকম্প হয়ে দেখা দেবে।

পুরানো অনেক প্রভাবশালী পরিবার ড্রাগের ব্যবসায় হাত দিতে না চাওয়ার কারণে হারিয়ে গেছে। অনেক ছোট পরিবার, ড্রাগ ব্যবসার লাভ থেকে 'সৈন্য' কিনে, বড় পরিবার হয়ে উঠেছে। কোন পরিবার যদি একবারে নিশ্চিতভাবে প্রচুর হেরোইন আমদানি করতে পারে, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মাফিয়া জগতে রাতারাতি তার প্রভাব আর মর্যাদা বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।

এরকম একটা সুযোগ ডি' মোনা হাতছাড়া করতে পারবে না, হোক তা অচেনা এক আগন্তুকের মুখের কথা।

আবার এমনও হতে পারে, গোটা ব্যাপারটা দুর্বোধ্য আর অস্বস্তিকর লাগছে তার। হিসাবটা সে কোনভাবেই মেলাতে পারছে না।

বেডরুমে ফিরে এসে এক গাদা কাপড়চোপড় দিয়ে বিছানার মাঝখানে মানুষের একটা আকৃতি তৈরি করল রানা–যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কেউ।

বেরেটা খালি করে বুলেটগুলো নিয়ে গেছে দৈত্যাকার দেহরক্ষী। ওয়াল সেফ খুলে প্রিয় পিস্তল ওয়ালথারটা বের করল রানা। তোয়ালে দিয়ে জড়াল ওটা। তারপর আলো নিভিয়ে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষায় থাকল।

দু'ঘণ্টা পর ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে দরজা খুলে গেল। রানা জানে, ডি' মোনা চাইলে বিখ্যাত হোটেল হিলটনের 'নিরাপদ' স্যুইটের অতিরিক্ত চাবিও যোগাড় করতে পারে। সিটিংরুম থেকে বড়সড় একটা ছায়ামূর্তি ঢুকল বেডরুমে। হাতে পিস্তল।

বিছানার কাছে এসে থামল সে, পিস্তলটা কোমরে গুঁজল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, রানা মনে করে কাপড়চোপড়ের স্তূপটাকে জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে। পরমুহূর্তে এক লাফে সিধে হলো লোকটা, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে, হাত পৌঁছে গেছে কোমরে গোঁজা পিস্তলের বাঁটে।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দ পায়ে লোকটার পিছনে চলে এসেছে রানা। তোয়ালে মোড়া ওয়ালথারের বাঁট দিয়ে তার ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল ও। কোঁৎ করে আওয়াজ বেরুল মুখ থেকে, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারাল লোকটা।

দৈত্যাকার দেহরক্ষীকে নীচে পড়তে না দিয়ে মাঝ পথেই ধরে ফেলল রানা, তারপর নিঃশব্দে মেঝেতে শোয়াল। পিস্তলটা পা'জামার সঙ্গে কোমরে গুঁজল ও, তোয়ালেটাকে মুচড়ে রশি বানাল, তারপর দরজার পাশে সরে এসে আবার অপেক্ষায় থাকল।

সিটিংরুমে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ।

বেডরুমে কেউ ঢুকছে। 'তাড়াতাড়ি, মাইকেল!' ফিসফিস করল দ্বিতীয় দেহরক্ষী। গলাটা সামনে বাড়াতেই রানার তোয়ালে ফাঁসের মত প্যাঁচ খেয়ে গেল তার গলায়। আঁতকে উঠল লোকটা কিন্তু সামান্য আওয়াজও বের করতে পারল না মুখ দিয়ে।

হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে কাত করল রানা, তারপর হাঁটু দিয়ে মারল ওর উপর-পেটে, সোলার প্লেক্সাসে।

মেঝেতে শুয়ে পড়ে দু'একবার হাত-পা নেড়েই স্থির হয়ে গেল লোকটা। মাপা মার, শুধু জ্ঞান হারিয়েছে, মরবে না।

ওদের পিস্তল দুটো থেকে গুলি বের করে নিল রানা। ওর অচেতন দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য চাকা লাগানো বড় একটা লন্ড্রি ট্রলি নিয়ে এসেছে ডি' মোনার দেহরক্ষীরা, দরজা খুলে করিডর থেকে সেটাকে সিটিংরুমে ঢোকাল ও। হাত চালিয়ে কাপড়চোপড় পরে নিল, জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিল লোকগুলোর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র আর চাবি। লন্ড্রি ট্রলিটা এত বড়, লোক দু'জনকে তুলবার পরও গর্তটা পুরোপুরি ভরল না। ময়লা একটা চাদর দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখল রানা।

ডি' মোনা উঠেছে বাইশতলায়, টপ ফ্লোর স্যুইটে। করিডর ফাঁকা পেয়ে সোজা সার্ভিস এলিভেটরে এসে চড়ল রানা।

এলিভেটর টপ ফ্লোরে উঠছে, পিস্তলটা হাতে নিয়ে চেক করল রানা। ওয়ালথার খুব কাজের জিনিস, পঁচিশ গজের মধ্যে যে-কোন টার্গেটে লাগাতে পারবে ও। কোন হোটেলরুমই অত বড় হয় না।

চার

'আমি মাইকেল,' ডি' মোনার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল রানা।

কবাট সামান্য একটু খুলেছে কি খোলেনি, ট্রলিটা খুব জোরে ঠেলে দিল রানা। দরজার পাল্লা উড়ে গিয়ে বাড়ি খেল ডি' মোনার চোয়ালে। ট্রলি সবেগে ছুটে চলেছে—একটা কফি টেবিলকে উল্টে দিল, তারপর নিজেও কাত হয়ে উগরে দিল নোংরা কাপড়চোপড় আর দুই আততায়ীকে।

রানার একটা হাত ডি' মোনার গলা চেপে ধরেছে, অপর হাতের পিস্তলের নল ডুবে আছে নাভিতে। ঠেলে তাকে একটা চেয়ারের উপর নিয়ে এল রানা।

'আমাকে ধরে আনার জন্যে পিস্তলবাজ পাঠিয়েছিলে? ভেবেছিলে আমাকে কোণঠাসা করে ব্যবসার গুমোরটা জেনে নেবে? অনেক হয়েছে ডি' মোনা এসো এবার আমরা সিরিয়াস হই।'

'নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখেছ, এই আচরণ কার সঙ্গে করছ তুমি, আরসালান? আমি একজন ডন! মাফিয়া তোমাকে পিঁপড়ের মত টিপে মেরে ফেলবে।'

'আর আমি?' ঠোঁটে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি জানো, আমি কী হতে যাচ্ছি? তোমার মত কত মাফিয়া ডন আমার গুডবুকে থাকার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে, সে খেয়াল আছে?'

ঢোক গিলল ডি' মোনা। 'কী চাও তুমি, আরসালান?'

'সিরিয়াস হতে বলছি। সিরিয়াস মানে তুমি আমার কাছে দশ লাখ ডলার জমা রাখবে, আমার সার্ভিস পাওয়ার আশায়। তুমি যে ভুল করেছ, এই জামানত তার হালকা শাস্তিও বলতে পারো।'

'দশ লাখ ডলার? কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছু পাব না?' নার্ভ শক্ত করে জানতে চাইল ডি' মোনা।

'তুমি আমার কলিং কার্ড নিচ্ছ।' হেরোইন ভর্তি ব্যাগটা তার পকেটে গুঁজে দিল রানা। 'তা ছাড়াও, তোমাকে আমি তিনটে নতুন জীবন দিচ্ছি। বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না, শুধু ঘাড় বাঁকা করে চারদিকে একবার চোখ বুলাও আর গোনো।'

'ভেবো না তুমি পালাতে পারবে।'

'পালাতে চাইলে কী এখানে আমি আসতাম? মন দিয়ে শোনো। আমি এখান থেকে চলে যাবার পর, চাইব তুমি আমাকে খুঁজে পাও। আসলে, ঠিক কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে, এটা আমিই তোমাকে জানাব, তুমি যাতে একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতে পারো।

'প্রতিনিধি লোকটাকে তোমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত হতে হবে। তার কাজ কী? তার কাজ হবে আমি কীভাবে চালানটা নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাচ্ছি সেটা দেখা।

'কিন্তু তুমি যদি আমাকে মারার জন্যে কাউকে পাঠাও, আমার হাতে খুন হয়ে যাবে সে। তোমার জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।' লোকটার গলা ছেড়ে দিল রানা, পিস্তলটাও তলপেট থেকে সরিয়ে নিল।

'তোমার আসলে পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, আরসালান।'

'তুরকিদের তুমি চেনো না? আমরা মান-সম্মানকে খুব বড় করে দেখি। আমাদেরকে কর্সিকানদের সঙ্গে এক কাতারে ফেলো না। তুরস্কের আফিম বেচে সমস্ত লাভ এতদিন একা শুধু ওরাই পেয়েছে। কিন্তু দিন এখন বদলাবে।

'তো যা বলছিলাম–তোমাকে একটা চুক্তিতে আসার সুযোগ দিয়েছিলাম। সুযোগটা এখনও আছে।'

টেবিল হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার খুঁজল ডি' মোনা। তারপর

সময় নিয়ে ধরাল একটা। সে যেন ইচ্ছে করে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে রানাকে। 'তা, দশ লাখ ডলার কীভাবে তুমি আদায় করতে চাও, আরসালান? এখানে আমাকে পিস্তলের মুখে বসিয়ে রাখবে আর ব্যাঙ্কে পাঠাবে আমার দেহরক্ষীদের?'

'দেখাচ্ছি কীভাবে।'

এখন ভোর চারটে হলেও, বৈরুতের কিছু ব্যাঙ্ক কখনোই বন্ধ হয় না। সব ক্যাসিনোতেই ব্যাঙ্কের শাখা আছে, তা ছাড়া প্রাইভেট মানি চেঞ্জারও আছে–চুপিচুপি সোনা, না-কাটা হীরে কিংবা স্টক সার্টিফিকেট জমা নিয়ে টাকা দেয়।

ফোনের রিসিভার তুলল রানা, ডায়াল করল, কথা বলল চোস্ত আরবীতে। তারপর, চেঞ্জার নিজে লাইনে আসতে, আরবীর বদলে অনর্গল পর্তুগিজ চালাল। গোটা ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে রানার সময় লাগল মাত্র এক মিনিট।

'এরপর কী?' রানা যোগাযোগ কেটে দিতে জানতে চাইল ডি' মোনা।

'এখন আমরা পরস্পরের সান্নিধ্য-সুখ উপভোগ করব। তুমি সিগারেট ধরাও, মদ খাও–তোমার যা খুশি।'

'ধন্যবাদ। তুমি বলতে চাইছ আমরা স্রেফ অপেক্ষা করব এখানে?'

'শোনোনি, তিনি যদি পাহাড়ের কাছে যেতে না পারেন, পাহাড় তাঁর কাছে চলে আসে? মানি চেঞ্জারের বেলায় ঠিক তাই ঘটছে। টাকার পাহাড়টা এখানে চলে আসছে।'

মানি চেঞ্জার পৌঁছাতে সময় নিল পনেরো মিনিট। ইতিমধ্যে ডি' মোনার দেহরক্ষীরা মেঝে থেকে উঠেছে। এই মুহূর্তে একটা সোফায় পাশাপাশি বসে মুখ হাঁড়ি করে রানাকে দেখছে। ব্যথায় দু'জনেই কাতর, তবে ডি' মোনার ভয়ে গোঙাতে বা ফোঁপাতে পারছে না।

'আমি কমপ্রেসো হেক্টর,' নিজের পরিচয় দিল পর্তুগিজ মানি চেঞ্জার। লোকটা ছোটখাট, পরনে ধোপদুরস্ত কাপড়চোপড়, নামকরা কোন রেস্তোরাঁর হেড ওয়েটারের মত চটপটে।

হেক্টর তার সহকারীর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল না। সহকারী লোকটা আফ্রিকান নিগ্রো, মাথাটা কামানো, কাঁধ দুটো ঘরের দুই দেয়াল ছুঁতে চাইছে।

'আপনারা প্রয়োজনীয় সব কাগজ-পত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল প্রক্টর। 'জী।'

'ব্যাপার কী, কী ঘটছে এখানে?' প্রায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল ডি' মোনা।

কফি টেবিলে একটা অ্যাটাশে কেস রাখল আফ্রিকান লোকটা। সেটা খুলে গুণে গুণে মার্কিন ডলারের এগারোটা বান্ডিল বের করল, প্রতি বান্ডিলে এক হাজার ডলারের একশোটা করে নোট রয়েছে–সব মিলিয়ে এগারো লাখ ডলার।

'তুমি বললে দশ লাখ!' ডি' মোনা সম্ভবত দাঁতে দাঁত পিষল।

'দশ লাখই নিচ্ছি আমি। বাকিটা সিনর হেক্টরের কমিশন,' ব্যাখ্যা করল রানা। ওয়ালথারটা আরেকটু সোজা করে ধরল ও। 'দেরি করছ কেন, ডি' মোনা? চেকটা এবার লিখে ফেলো।'

‘এই টাকা তোমাকে খরচ করতে হবে না, আরসালান! তার আগেই ধড়ফড়িয়ে মারা যাবে তুমি,’ নিঃশ্বাসের সঙ্গে হিসহিস করে বলল মাফিয়া পরিবার-প্রধান।

তার হাতে তারই ট্রাভেলার্স চেকটা ধরিয়ে দিল রানা, ভাগ্যগুণে টেবিলেই পড়ে ছিল ওটা। ‘চাই না রাইটার’স ক্র্যাম্পে কষ্ট পাও, শুধু নাম আর তারিখটা লিখলেই চলবে,’ বলল রানা।

কাউকে দিয়ে ট্রাভেলার্স চেক লিখিয়ে নেওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। নিজের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে সঙ্গে করে একটা রাবার স্ট্যাম্প নিয়ে এসেছে হেক্টর, দেখে ডি' মোনার মেজাজ আরও খানিকটা চড়ল।

‘নাও, এবার রেহাই দাও আমাকে!’ চেকটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রায় বিস্ফোরিত হলো সে।

‘এত তাড়াতাড়ি?’ হাসল রানা, মাথা নাড়ছে। মানি চেঞ্জারকে এক লাখ ডলার দিল ও, বাকি টাকা সহ অ্যাটাশে কেসটা রাখল নিজের কাছে। ‘বাকি পেপারওঅর্কও এখনই সেরে ফেলব আমরা। কেন না, এখন এই টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলে আমাকে চোর বলা যাবে।’

‘ট্র্যান্সফার পেপার রেডি–তিন কপি করে টাইপ করা, সাক্ষীদের সই নেয়া, অফিশিয়াল সিল মারা,’ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত করে ডি' মোনাকে আশ্বস্ত করল হেক্টর।

‘আবার কী?’ পর্তুগিজকে ছাড়িয়ে রানার দিকে ছুটে এল ডি' মোনার দৃষ্টি।

‘সই করুন, প্লিজ–এখানে, এখানে আর এখানে।’ অত্যন্ত অফিশিয়াল চেহারার ওনিয়নস্কিন এগ্রিমেন্টটার ভাঁজ খুলল হেক্টর।

‘সই করো,’ রানাও তাগাদা দিল, হাতের পিস্তলটা আবার একটু সিধে করে ধরল।

তিনবার সই করল ডি' মোনা। তারপর স্টেটমেন্টটা পড়ল সে। ‘এখানে বলা হয়েছে এই মাত্র আমি কাদের যেন পাঁচশো শেয়ার কিনেছি!’

‘কাদের মানে ছোট একটা জার্মান রিয়েল এস্টেট কোম্পানির। কোম্পানির নাম ডাফম্যান ওবারসি বেনিফিট। ঘটনাচক্রে, আমিই ওটার মালিক,’ বলল রানা। তবে বলল না যে এই কোম্পানি সম্প্রতি এক্সপোর্ট কোয়ালিটি চকলেটও তৈরি করছে। যেহেতু কোম্পানির এটা নতুন ব্যবসা, তাই কোন বিজনেস গাইডবুকে তথ্যটা পাওয়া যাবে না। ‘তবে না, তুমি কোন শেয়ার কেনোনি। তুমি শুধু ওই নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার এক বছর সময় সীমার মধ্যে বিক্রি করার অধিকার কিনেছ। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই। খুব ভাল একটা বিনিয়োগ হয়েছে।’

‘এই শালার কোম্পানির নাম কেউ কোনদিন শোনেনি। এই শেয়ারের কোন দামই নেই!’

‘দর কষতে ওস্তাদ!’ হেক্টরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল রানা। তারপর ডি' মোনার দিকে ফিরে বলল, ‘নিজেকে বোকা বানিয়ো না। তোমার আসলে বোঝারই ক্ষমতা নেই কত ভাল একটা ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছ।

‘যাকগে। সিনর হেক্টরের সঙ্গে চলে যাচ্ছি আমি। তুমি আমাকে এক হপ্তা

আর দেখতে পাবে না। ততদিনে তোমাকে জানাব কোথায় আছি। তুমি আমার বিশ্বস্ত পার্টনার হবে, না কি রাগী আর বোকা থেকে গিয়ে জামানত খোয়াবার ঝুঁকি নেবে, সেটা আমি তোমার বিবেচনার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আর আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি তোমার নিয়তির হাতে,' সোফা থেকে বলল দৈত্যাকার দেহরক্ষী। 'রাস্তা-ঘাটে হঠাৎ লাশ হয়ে গেলে আমরা কেউ দায়ী থাকব না।'

ট্র্যাফিক পুলিশের মত একটা হাত তুলে দেহরক্ষীকে থামিয়ে দিল ডি' মোনা। মাথা ঠাণ্ডা করে মিনিট খানেক চিন্তা করবার সময় পেয়েছে সে। 'বলেছ, তুমি কীভাবে অপারেট করবে তা দেখার জন্যে আমি একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারব। সে যদি রিপোর্ট করে যে তার ধারণা তোমার সিস্টেমটা অবাস্তব, তাতে কোন কাজ হবে না–তখন কী হবে?'

'জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে তোমাকে। তবে জেনে রাখো, সেরকম কিছু ঘটবে না।' ডি' মোনার দিকে ঝুঁকল রানা, দেহরক্ষীদের খালি অস্ত্র দুটো তার কোলে ফেলল। 'এতক্ষণে অন্তত এটা তুমি জেনেছ যে,' ইঙ্গিতে ট্রলিটা দেখাল ও, 'আমি ঠিকই ডেলিভারি দিতে পারি।'

পাঁচ

ইজমির শহর মাউন্ট পাবাস-এর ঢাল থেকে শুরু হয়ে সাগরের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ধুলোমাখা একটা পাম গাছের পাশেই ইন্টারন্যাশন্যাল হার্ভেস্টার ট্র্যাক্টর কোম্পানির বিলবোর্ড দেখা যাচ্ছে। আরেক দিকে ষোলোশো শতাব্দীর মসজিদের পাশে স্কাই স্ক্র্যাপার দাঁড়িয়ে। স্কাই স্ক্র্যাপারের উল্টোদিকে রোমান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ।

রাস্তায় স্বাস্থ্যবান লোকজন। তাদের প্রায় প্রত্যেকের মাথায় কাপড়ের ক্যাপ। মেয়েরা ঢোলা প্যান্ট আর ব্লাউজ পরেছে। বোরকা আছে, তবে খুব কম। আতার্তুক স্কয়্যারে জিনস্ পরা মেয়েদেরও দেখতে পাওয়া গেল, বুকে বই-খাতা চেপে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে।

বেশ কয়েকজন আমেরিকান পাইলটকে দেখল রানা, ট্যাক্সি নিয়ে শহর দেখতে বেরিয়েছে।

পাহাড় চূড়ার কাছাকাছি প্রাচীন একটা দুর্গ রয়েছে। পারসী সাম্রাজ্য দখল করবার পর মহামতি আলেকজান্ডার এটা বানিয়েছিলেন।

কালের অবক্ষয়ে দুর্গটা বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছু নয়, তবে গা ঢাকা দিয়ে চারপাশে নজর রাখবার জন্য জায়গাটা আদর্শ।

পাথরের চওড়া একটা পাঁচিলে বসে পাহাড়ী ঢালের আধ মাইল নীচের একটা রেস্তোরাঁর দিকে বিনকিউলার তাক করেছে রানা। আঙুর লতা দিয়ে ঘেরা খোলা

একটা উঠানে বসে লোকজন লাঞ্চ সারছে। জানালা দিয়ে কিচেনের ভিতরটাও দেখা যাচ্ছে। ডিশে রোস্ট করা হাঁস আর হলুদ পুডিং সাজানো হচ্ছে।

উর্দি আর লাল ফেজ হ্যাট পরা একজন ওয়েটার এক আমেরিকান মধ্যবয়স্ক দম্পতিকে সার্ভ করছে। আরেক টেবিলে দু'জন পেশিবহুল তরুণ খেতে বসেছে, দু'জনের মাথাতেই ঝাঁকড়া চুল, তবে তারা যত না খাচ্ছে তারচেয়ে বেশি তর্ক করছে—অর্থাৎ সাধারণ তুরকি এরা, আততায়ী নয়।

সবচেয়ে ভাল টেবিলটায় একটা মেয়ে একা বসে আছে, রূপ আর সাজপোশাক দেখে মডেল বলে মনে হয়। পিঁয়াজের রঙ নিয়ে মাথায় একরাশ চুল, মুখের আকৃতি অপরূপ পানপাতা। পা দুটো লম্বা।

রুচিসম্মত, স্টাইলিশ ড্রেস দেখে বোঝা যায় মেয়েটা ফরাসী। নিজের উপর জোর খাটিয়ে বিনকিউলার ঘুরিয়ে নিল রানা। খুনী খুঁজছে ও, সেক্স সিম্বল নয়।

তিনদিন আগে ডি' মোনাকে মেসেজ পাঠিয়েছে রানা, সে তার প্রতিনিধিকে এই রেস্তোরাঁয় পাঠাতে পারে। ওখানে দু'জন একটা সমঝোতায় আসবে, নয়তো পাথুরে চাতালে রক্তপাত ঘটাবে।

ডি' মোনার লোক এখনও এসে পৌঁছায়নি। হাতঘড়ি দেখল রানা। নির্দিষ্ট সময় পার হতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। ঢাল বেয়ে রেস্তোরাঁয় নামতেও ওই পাঁচ মিনিটই লাগবে ওর।

পাঁচিলের উপর দামী বিনকিউলারটা ফেলে যাচ্ছে রানা, ভাগ্যবান কোন কিশোর দেখতে পেলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠবে। শহরের ভিতর দিয়ে নীচে নামবার সময় আঁকাবাঁকা রাস্তার পাশে রেইলিং দিয়ে ঘেরা বাড়ির বারান্দায় কিশোর ছেলেমেয়েদের খেলতে বা গল্প করতে দেখল রানা। অনেকেই ওর দিকে তাকাচ্ছে, তবে খুব একটা কৌতূহল নিয়ে নয়। রানা একজন তুরকি, অন্তত যতক্ষণ আদালতে অন্য কিছু প্রমাণিত না হয়।

হাত দিয়ে প্রিয় ওয়ালথার, ছুরি আর ছোট একটা গ্রেনেডের স্পর্শ নিল রানা। হয়তো কিছুই ঘটবে না, কিংবা হয়তো রীতিমত একটা যুদ্ধ বেধে যাবে।

বাঁক নিয়ে রেস্তোরাঁর নিজস্ব চাতালে উঠে এল রানা। মধ্যবয়স্ক আমেরিকানদের বদলে টেবিলটায় এখন কয়েকজন স্থানীয় টিন এজার বসেছে, সবার কাছে একটা করে মোবাইল ফোন।

পেশিবহুল তরুণ দু'জন তর্ক থামিয়ে ডোমিনো খেলছে; আবার ঝগড়া বাধা স্রেফ সময়ের ব্যাপার। রেস্তোরাঁর মালিক, ভুঁড়িটা শার্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল রানাকে। ঠিক এই সময় খেয়াল করল ও—ওকে ছাড়িয়ে ওর পিছন দিকে চলে গেছে তার দৃষ্টি।

ঘুরল রানা।

কালো সুট আর হ্যাট পরা চারজন ওরা। কলারগুলো নেকটাই ছাড়াই বোতাম দিয়ে আটকানো। প্রত্যেকে একটা করে মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট বহন করছে।

লোকগুলো নিশ্চয়ই রেস্তোরাঁর উল্টোদিকের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছে, কারণ আশপাশে আর কোন বাড়ি নেই, গেটে কোন গাড়িও দেখা যাচ্ছে না।

জ্যাকেটের ভিতর হাত গলিয়ে ওয়ালথারের বাঁট ধরল রানা। মিউজিশিয়ানদের লিডার তার কেসটা খুলে একটা ব্যালালাইকা– তেকোনা তিনতারা–বের করল।

'আমি আপনার কোনও সাহায্যে আসতে পারি, মিস্টার আরসালান?' সুরেলা নারীকণ্ঠ, শরীরে আশ্চর্য একটা শিহরণ জাগল রানার।

আবার ঘুরল রানা। ফ্যাশন মডেল মেয়েটি চোখে নিখাদ কৌতূহল আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই প্রথম খেয়াল করল রানা, তার টেবিলটা দু'জনের জন্য সাজানো।

মেয়েটি তা হলে মডেল নয়, তবে এত সুন্দর যে বেশ কিছু দিন এই চেহারা ভোলা যাবে না। ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়স। কালো চোখ দুটো পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। লালচে-সোনালি চুল। নাকটা রোমানদের মত খাড়া। ফ্রেঞ্চ ড্রেস তার সুডৌল স্তন আর সুগঠিত নিতম্বের আকৃতি গোপন রাখেনি। মুখের হাসি হাসি ভাবটা কৌতুক, বুদ্ধির দীপ্তি আর যৌনাবেদন ছড়াচ্ছে।

বসল রানা, বিস্ময় গোপন না করে সরাসরি তাকিয়ে থাকল।

'আমার জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। বাচন ভঙ্গিতে মার্কিন টান স্পষ্ট, তবে উচ্চারণে আভিজাত্য আছে, আছে মাধুর্য আর ইতালীয় ঝঙ্কার। তার চোখে পলক পড়ছে না; পরিষ্কার বোঝা যায়, কল্পনার সঙ্গে আরসালানকে সে মেলাতে পারছে না। চেহারায় এমন বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক আর পৌরুষ বোধহয় সে আশা করেনি।

'একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। তবে তোমার মত কারও জন্যে নয়।'

'তোমাকে আসলে মোটেও নার্ভাস লাগছে না,' ধীরে ধীরে বলল মেয়েটি। 'তবে আমি জানি তুরকি পুরুষরা মেয়েদের ব্যাপারে কেমন হয়।'

'সত্যি জানো?' এক সেকেন্ড প্রশ্নটাকে বাতাসে ভেসে থাকতে দিল রানা, তারপর আবার বলল, 'আমি আবার জানি তোমাদের পুরুষরা মেয়েদের ব্যাপারে কেমন হয়। মানে, ব্যবসার ক্ষেত্রে আর কী। ভাবছি তোমাকে পাঠাবার ব্যাপারে তারা সিরিয়াস কি না।'

আলতো করে রানার হাতটা একবার ছুঁলো মেয়েটা। 'মাই ডিয়ার মিস্টার আরসালান, তুমি কি ভেবেছ তারা সিরিয়াস না হলে আমি আসতাম?' ওদের পিছনে মিউজিশিয়ানরা তাদের ইন্সট্রুমেন্ট টিউন করছে।

'আসলে আমার আগ্রহকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত,' আবার বলল মেয়েটি। 'ওই লোকগুলো পিস্তলের বদলে ব্যালালাইকা নিয়ে এসেছে, সেজন্যে। মিটিঙে বসে অনেকেই প্রস্তাব রাখে, প্রথম সুযোগেই তোমার খুলি উড়িয়ে দিতে হবে। এখানে ভাল কী অর্ডার দেওয়া যায়?' মেয়েটির ব্যবহার সাবলীল আর আত্মবিশ্বাসী।

ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিল রানা–হাঁসের বুক, রসুনের আচার, সাদা পনির, তুরকি ভেজিটেবল স্যালাড আর স্থানীয় পানীয় রাকির একটা বোতল।

'আরসালান, তাই না? এটা তোমার আসল নাম? না কি ডাক নাম?'

'এই নামে আমাকে তুমি ডাকতে পারো। আমি তোমাকে কী নামে ডাকব?'

'নাদিয়া গারফিল্ড।'

'সেক্ষেত্রে আমি কি তাহলে তোমাকে নাদিয়া বলে ডাকব, আমেরিকানদের অনুকরণে?'

'নাহ্, তোমার পক্ষে আমেরিকান হওয়া সম্ভব নয়।' হেসে উঠল নাদিয়া। 'তবে তুমি আসলে কী তা আমি জেনে নেব।'

খাওয়ার সময় খুব কম কথা হলো। ওয়েটার কফি দিয়ে গেল ওদেরকে। হঠাৎ বাতাস শুরু হওয়ায় নাদিয়ার পিঁয়াজ-রাঙা চুল উড়ছে।

'কিছু সমস্যা সম্পর্কে তুমি হয়তো সচেতন নও।'

হাসি হাসি মুখ করে তাকাল নাদিয়া। 'যেমন?'

'বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হবে আমাদের–কোনটা বড় শহর, আবার হয়তো ছোট গ্রাম। কিছু কায়িক পরিশ্রমের কাজ আছে, ছোট মাপের কিছু বিপদের ঝুঁকিও আছে।'

'জানি না কী বলতে চাইছ।'

'আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার সঙ্গে ঘোরার জন্যে একজন পুরুষকে পাঠানো হবে। কিন্তু এখন এত দেরি হয়ে গেছে যে প্ল্যান শুধরে নেয়া সম্ভব নয়।'

'এ-সব দিক আমি ভেবেছি, আরসালান। আমাকে যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁরাও ভেবেচিন্তেই পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, একটা মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে তুমি কি ভয় পাও?'

'আমি ভয় পাই দুর্বলতা, রূপের দেমাক আর নির্বুদ্ধিতাকে। দুনিয়ার সব মেয়ের মধ্যে হয়তো নয়, তবে আমেরিকান মেয়েদের মধ্যে এসব প্রচুর দেখা যায়।' দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো রানার, দেখতে চায় রাগে মেয়েটা লাল হয় কি না।

'তুমি অভিযোগ করার কোন সুযোগ পাবে না,' উত্তর দিল নাদিয়া, কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই।

মিউজিশিয়ানদের ছোট্ট ব্যান্ডটা ইতিমধ্যে জমিয়ে তুলেছে, পালা করে প্রতিটি টেবিলের সামনে থেমে বাজাচ্ছে তারা। নাদিয়া আর রানাকে দেখে কেউ যদি প্রেমিক-প্রেমিকা বলে মনে করে, তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু এখানে বসে একশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে মৃত্যু আর দুর্দশা ডেকে আনবার প্ল্যান করছে ওরা।

'এবার তোমার কথা বলো, আরসালান। কথা দিচ্ছ, দু'মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ডেলিভারি? বোটে, না প্লেনে?' প্রশ্নের ভিতর প্রশ্ন ঢুকিয়ে রানাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে নাদিয়া, উত্তর আদায় করবার পুরানো একটা কৌশল এটা।

'সে তুমি দেখতেই পাবে।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, বুঝি সেটা। কিন্তু যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে রিপোর্ট করতে হবে আমার। এ তো আর ভুলে থাকা সম্ভব নয় যে তোমার কাছে দশ লাখ ডলার জমা আছে আমাদের।'

'কীসের জমা? দশ লাখ ডলার দিয়ে আমার কোম্পানির শেয়ার কিনেছ তোমরা। সবই আইনসম্মতভাবে করা হয়েছে।'

'ওটা অখ্যাত এক জার্মান কোম্পানি, নিজের কাভার হিসেবে ব্যবহার করেছ।

তুমিও জানতে আমরা চেক করব। ওরা দক্ষিণ আফ্রিকা আর আমেরিকায় ফ্ল্যাটবাড়ি বিক্রি করে। দুঃখিত, এ-ব্যবসায়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

বাঁ হাতের মধ্যমায় পরা হীরের আঙটিটা ডান হাতের আঙুল দিয়ে নাড়ছে নাদিয়া। 'তবে, বিজনেস কাভার কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে, সে-সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। ওই দশ লাখ ডলারকে আমরা প্রথম কিস্তি বলে ধরে নিয়েছি, বাকি নব্বই লাখ ডলার নিউ ইয়র্কে মাল ডেলিভারি দেয়ার পর পাবে তুমি। এরচেয়ে লাভজনক ব্যবসা দুনিয়াতে আর আছে? তুরস্ক থেকে দুশো কিলো কিনছ মাত্র দু'হাজার ডলারে। ভাবা যায়!'

সৌন্দর্যের আধার অবয়ব আর যৌবন ভারাক্রান্ত শরীরটার আড়ালে লুকিয়ে আছে একজন মাফিওসোর ইস্পাত কঠিন মন। আলাপ আর আচরণ থেকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে, নাদিয়া গারফিল্ড অল্পজলের মাছ নয়। 'দেখো নাদিয়া, আমার সঙ্গে খেলতে চাওয়াটা ভুল হবে। কর্সিকানদের আমি ব্যবসা থেকে ভাগাতে চাই। তুমি যে দাম দিতে চাইছ, ওই দাম মার্সেই থেকে পাইকারি দরে হেরোইন কেনার সময় দাও তোমরা। নিউ ইয়র্কে ডেলিভারি হবে, তাই দামও বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে দুই কোটি ডলার দেবে, নাদিয়া। তার ওপর দশ লাখ ডলারের একটা বোনাস।'

'কেন, কী কারণে তা আমরা দিতে যাব?'

'কারণ এটাই আমার মূল্য। কারণ একক শিপমেন্টে এত হেরোইন একসঙ্গে কখনোই তোমরা পাওনি। কারণ মানের দিক থেকে এটা সেরা। আরেকটা কারণ, এই শালার জঘন্য মিউজিক আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে।'

ইতিমধ্যে ওদেরকে ঘিরে ধরেছে চার তরুণ মিউজিশিয়ান। বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানে কান ঝালাপালা, তার উপর চারজনই গাধার মত চেঁচাচ্ছে বিরতিহীন।

'তুমি টার্কিশ মিউজিক পছন্দ করো না?' বিস্মিত হওয়ার ভান করল নাদিয়া।

'এই ব্যাটা ব্যালালাইকা বাজাতে জানলে তো ভাল্লাগবে!' ব্যান্ড লিডারের দিকে হাত বাড়াল রানা। জ্যাকেটটা ফাঁক করতেই বেল্টে গোঁজা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ পিস্তলটা দেখতে পেল ও। ওটার পাশে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল। আরেকটা নোট ফেলল টেবিলে, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবার সময়। 'তুমি উঠছ কোথায়?' মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল ও।

বিস্মিত হয়েছে নাদিয়া, তবে হতভম্ব নয়। 'টার্কি শেরাটনে।'

'শুধু একটা নাইটব্যাগ নিয়ে ঠিক চার ঘণ্টা পর ওটার বাইরে থেকো। অবশ্যই একা।'

'আরসালান,' রানা চলে যাচ্ছে দেখে ডাকল নাদিয়া।

'বলো।'

'তুমি চিনবে না, ভারতীয় একজন সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—তোমার সঙ্গে আমার ভালই বনবে।'

'কী নাম? হয়তো চিনতেও পারি।'

'পুরো নাম জানি না, জানি সংক্ষেপটুকু—রাত্রি।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা গোপন করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল রানা, দ্রুত পায়ে হাঁটছে। অনন্য রায়হান তার প্যাডে এই শব্দটাই লিখেছিল–রাত্রি। 'না, এই নামে কাউকে আমি চিনি না।'

বেল্ট থেকে নোটটা বের করতে গিয়ে ব্যান্ড লিডার হাতের ব্যালালাইকাটা ফেলে দিল। মেঝেতে পড়ে বিষণ্ন, কাতর শব্দ করল সেটা।

দীঘায়, অর্থাৎ মেদিনীপুরে, আমেরিকানরাও তদন্ত করবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। রানার পুরানো বন্ধু নিক হিউবার্ট অ্যান্টি নারকোটিক স্কোয়াডের তরফ থেকে কিছু আন্দাজ করে তদন্ত করতে এসেছিল রাজিব ত্রিপাঠির আকস্মিক অন্তর্ধান রহস্য।

কুশলাদি বিনিময়ের পর নিজের কেস সম্পর্কে যা জানে সবই বন্ধুকে বলে গেল হিউবার্ট। তারপর প্রশ্ন করল, তোর কেসটা কী?'

'আমি মুখ খোলার আগে তোকে একটা শর্ত পূরণ করতে হবে, দোস্ত,' বলল রানা।

ভুরু কোঁচকাল হিউবার্ট। 'শর্ত? কী শর্ত?'

'আমাকে নানাভাবে সাহায্য করার সুযোগ আছে তোর। কথা দে সুযোগগুলো তুই হারাবি না।'

সাবধানী একটা ভাব ফুটে উঠল হিউবার্টের চেহারায়। 'তোর মতলব আমার বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, যা, দিলাম কথা। এবার বল, তোর কেসটা কী?'

রানা বলল, 'তোর আর আমার কেস বলতে গেলে একই।'

'ওয়ান্ডারফুল!' উৎফুল্ল হয়ে উঠল হিউবার্ট। 'কত দূর এগিয়েছে তোর তদন্ত?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা বলা যাবে না।'

'সে কী! আমি যে তোকে আমার কেস সম্পর্কে লেটেস্ট সব কিছু জানিয়ে দিলাম?'

'তুই যদি বোকা হোস, সে দোষ কি আমার? কথা দিয়েছিস, এখন কিন্তু সাহায্য করতে অস্বীকার করতে পারবি না! ভাল কথা, শর্ত আরও একটা আছে–তুই কিন্তু দোস্ত আমাকে ফলো করতে পারবি না।

'ঠিক আছে, আমিও তোকে কেমন ধাঁধায় ফেলে দিই দেখ তাহলে। তোর সাহায্য বলতে দরকার কয়েক আউন্স বিশুদ্ধ হেরোইন আর দুশো বিশ পাউন্ড আফিম, এই তো?' একটু থেমে হাসল হিউবার্ট। 'হাঁ করে আছিস কেন রে? মুখের ভেতর মাছি ঢুকে যাবে যে!'

দারোগাবাবু, অর্থাৎ সদাশয় গুপ্ত, ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিয়েছেন রানাকে। তার মধ্যে একটা হলো: বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছিল রামনগর থানার কৃষ্ণনগর গ্রামের একটা অশ্বত্থ গাছের তলায়। গাছটার সামনে দিয়ে হাটে যাওয়ার মেঠো পথ চলে গেছে। পথিকরা

ওখানে থেমে যা জানতে চাইত, ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী তার জবাব দিতেন। ইনিই ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি।

যতই অবিশ্বাস্য শোনাক, সত্য হলো, গোটা এলাকায় রটে গেল ভগবান ত্রিপাঠির প্রতিটি জবাব আসলে ভবিষ্যদ্বাণী, এবং সে-সব অক্ষরে অক্ষরে ফলেও যাচ্ছে।

তারপর, যেমন হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি একদিন হঠাৎ করেই ভগবান ত্রিপাঠি গায়েব হয়ে গেলেন।

মাঝখানের সময়টায় বহু ঘটনাই ঘটেছে, তবে সে-সব এখন রানার স্মরণ করবার প্রয়োজন নেই।

এই মুহূর্তে ওর মনে যে কথাটা জাগছে, অনন্য রায়হান তা হলে রাত্রি লিখে রাজীব ত্রিপাঠিই বোঝাতে চেয়েছিল। মেদিনীপুরের রামনগরে এই ভগবান সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে গেলে কেউ তাকে খুন করে।

কে বা কারা তারা?

ভগবান রাজীব ত্রিপাঠির পোষা গুণ্ডা?

রাজীব ত্রিপাঠির সঙ্গে মাফিয়ার কী সম্পর্ক? নাদিয়া গারফিল্ড কীভাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী জানবার সুযোগ পাচ্ছে?

চার ঘণ্টা পর আতাতুর্ক স্ট্রিট ছাড়িয়ে এল রানা, টার্কি শেরাটনের দিকে যাচ্ছে। নাদিয়াকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। বাচাল ট্যাক্সি ড্রাইভার আর সতর্ক ট্যুরিস্টদের ভিড়ে শিল্পী বটিচেলি-র আঁকা ভিনাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা আগ্নেয়াস্ত্রসহ পোশাক পরা ভিনাস, ভাবল রানা। কে জানে মেয়েদের উপযোগী কী অস্ত্র বহন করছে সে–বেরেটা, না কি আর কিছু?

চারপাশে মানুষ আর যানবাহনের এত ভিড়, অবাঞ্ছিত কাউকে খুঁজতে যাওয়াটা অর্থহীন মনে হলো রানার।

সিত্রোঁটা নাদিয়ার ঠিক সামনে থামাল ও। 'উঠে পড়ো!'

হাতব্যাগটা ছুঁড়ে ব্যাকসিটে ফেলল নাদিয়া, তারপর লাফ দিয়ে উঠে বসল রানার পাশে। স্পীড তুলে সাগর ঘেঁষা বুলেভার্ডে উঠে এল রানা, গালফ্ অভ ইজমিরকে বাঁকা একটা রেখা ধরে ঘিরে রেখেছে ওটা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল নাদিয়া। 'না কি প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল?'

রানা এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যার মানে–হ্যাঁ।

মাঝে মধ্যে গাড়ির সাইড মিররে চোখ রাখল রানা। ইজমিরের রাস্তা অটোমোটিভ মিউজিয়ামের মত, পার্থক্য শুধু সমস্ত পুরানো বুইক, প্যাকার্ড, ফোর্ড, প্লিমাথ, মরিস ইত্যাদি এখনও কীভাবে যেন চলছে। প্রায় প্রতিটি গাড়ি থেকে উপচে পড়ছে আরোহী।

এরকম একটা ক্যাব জনা বারো প্রৌঢ়কে নিয়ে অনুসরণ করছে রানাকে। তাদের চেহারা অবশ্য আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়।

বুলেভার্ড ধরে মাইল খানেক এগিয়ে বাঁক ঘুরে পাহাড়ী পথ নিল রানা। এক ঝাঁক ক্যাব থেকে বিচ্ছিন্ন হলো একটা, বাঁক ঘুরে পিছু নিল সিত্রোঁর।

পাঁচ-সাতটা ফলের বাগানকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, ক্যাবটা পিছু ছাড়ছে না। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি একা আসবে, নাদিয়া।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল নাদিয়া। 'ওরা দেখছি বেআদবি শুরু করেছে। এত করে বললাম সবাই যেন দূরে সরে থাকে।' তার চেহারায় অসন্তোষ, যেন গর্বে আঘাত লেগেছে।

'ওদের কি তোমার কাছ থেকে নির্দেশ পাবার কথা নয়?'

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল নাদিয়া।

'ইচ্ছে করলে ওদেরকে আমি খসাতে পারি, আবার ভোগাতেও পারি। কী চাও ঠিক করো, নাদিয়া।'

ক্যাবটা নাদিয়াকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে দিল। ওটা ১৯২০ সালের একটা বুইক, তবে পুরানোটা ফেলে দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন ফিট করা হয়েছে। তুমুল গতি তুলে ওদেরকে পাশ কাটাল সেটা। জানালা দিয়ে দুটো অস্ত্র বেরিয়ে আসতে দেখা গেল–রানার মাথার দিকে তাক করা–ওগুলো ঝাঁকিয়ে থামবার ইঙ্গিত করছে রানাকে। অস্ত্রধারীরা সাবেক ব্যালালাইকা শিল্পী। ওদের সামনে চলে যাওয়ার পর বুইকের টেইল লাইট জ্বলে উঠল। ব্রেক চেপেছে ড্রাইভার।

বুইকের পাওয়ার আছে, মানতেই হবে। কিন্তু সিত্রোঁতে যে সাসপেনশান আছে, দুনিয়ার খুব কম গাড়িতেই তা পাওয়া যাবে। নিজেদের প্রয়োজনে রানা এজেন্সির ইস্তাম্বুল শাখা আরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে এ-গাড়িতে।

ব্রেক না করে বাম দিকের পায়েচলা উঁচু-নিচু রাস্তায় সরে গিয়ে ওভারটেক করল রানা। বুইকের জানালা দিয়ে আবার একটা আগেয়াস্ত্র বেরিয়ে এল। তবে রানার বদলে ওর আরোহীকে গুলি লাগতে পারে, এই ভয়ে ট্রিগারে টান দিতে পারল না। পিছিয়ে গেল বুইক।

কয়েক সেকেন্ড পর ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে রানা বুঝতে পারল, বুইক আবার পাশ কাটাতে আসছে।

'তুমি দাঁড়িয়ে পড়তে পারো!' ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল নাদিয়ার কণ্ঠস্বর। 'ওদেরকে তুমি পেছনে ফেলতে পারবে না।'

ধুলোময় পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘন ঘন মোচড় খেয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা। একটার পর একটা চুলের কাঁটার মত বাঁক। সিত্রোঁকে পাশ কাটাবার কোন সুযোগই নেই বুইকের।

বাঁকগুলো অনায়াস সাবলীল ভঙ্গিতে পার হয়ে আসছে ফ্রেঞ্চ কার, কিন্তু বুইক প্রতিবার ঝাঁকি খাচ্ছে। রানা যখন গিয়ার তুলছে, বুইকের ড্রাইভার তখন কমাচ্ছে ওটা। তারপর দেখা গেল পাহাড়চূড়ায় উঠে একটা স্ট্রেটওয়ে ধরেছে সিত্রোঁ, স্পীড ঘণ্টায় ষাট মাইল, বেড়ে সত্তরে পৌঁছাচ্ছে।

আধ মিনিট পর চূড়ায় উঠে এল বুইক। ইতোমধ্যে গায়েব হয়ে গেছে ওরা। বুইকের সামনে পাঁচ মাইল স্ট্রেটওয়ে, অথচ অনুসরণ করবার জন্য তাতে কোন গাড়ি নেই।

বিকট আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল বুইক। তুরকিরা নীচে নেমে ফেজ খুলে

মাথা চুলকাচ্ছে। দু'জন একটা ফার্ম হাউসের দিকে হাত তুলল। রাস্তার ডান দিকে ওটা।

সবাই অস্ত্র বের করে ওটার দিকে হাঁটতে শুরু করল। গায়ে লাল-সাদা চকচকে পালক, একটা মুরগিকে তাড়িয়ে নিয়ে ফার্ম হাউসের কোণ ঘুরে বেরিয়ে এল একটা মোরগ। লোকগুলোকে দেখে প্রায় উড়ে চলে গেল দুটো দু'দিকে। ফার্ম হাউসটার কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

'সামান্য হয়তো এগিয়ে থাকতে পারব,' ফিসফিস করল নাদিয়া। তবে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। ফার্ম হাউসের উল্টো দিকে রয়েছে ওরা, অন্য একটা রাস্তার পাশে। উঁচু ঝোপের আড়ালে থাকায় সিত্রোঁকে ওরা দেখতে পাবে না।

'সিটবেল্ট বাঁধো,' বলামাত্র বিনা তর্কে, এমনকী ভুরু পর্যন্ত না কুঁচকে নির্দেশটা পালন করল নাদিয়া। 'এবার জবাব দাও। ওদেরকে আমি খসাব, না কি খুন করব?'

'তুমি দেখছি ভয়ানক সিরিয়াস,' রানাকে ওয়ালথার বের করতে দেখে মৃদু হেসে বলল নাদিয়া।

'ওরা সিরিয়াস নয় বলতে চাও? কী আদায় করতে চায় ওরা আমার কাছ থেকে? ওগুলো কি খেলনা পিস্তল? মতলবটা কী তোমাদের? এর সদুত্তর আমাকে পেতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল নাদিয়া, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'হয়তো খুব বেশি চটিয়ে দিয়েছ তুমি কোনও ডনকে।'

'ওরা তোমাদের লোক, কিন্তু দাঁড়িয়েছে আমার পথে। খসিয়ে দিতে পারি, আবার খুনও করতে পারি; কোন্‌টা চাও, বলে ফেলো!'

শান্তভাবে দুটো সম্ভাবনাই বিবেচনা করল নাদিয়া। 'এই পর্যায়ে খুনোখুনি পরিস্থিতিটাকে আরও জটিল করে তুলবে,' বলল সে। 'আমার বরং কৌতূহল হচ্ছে—দেখি কীভাবে ওদেরকে তুমি খসাতে পারো।'

'তা হলে শক্ত হয়ে বসো।'

সিত্রোঁকে নিউট্রালে ধরে রেখে একসালেরেটারে চাপ দিল রানা, যতক্ষণ না ট্যাকমিটারের কাঁটা সরে লালে না ঢুকল।

ফার্ম হাউসের ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে গেছে তুরকিরা, লাইনের শেষ লোকটা এরই মধ্যে ইতস্তত শুরু করেছে, চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে কোত্থেকে আসছে ইঞ্জিনের আওয়াজটা। সঙ্গীদের ডাকতে যাচ্ছে সে। তবে ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে তাদের।

জমিন শক্ত আর শুকনো। প্রথম গিয়ারে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল স্পিড তুলল রানা, দ্বিতীয়তে পঞ্চাশ।

ওরা যখন রাস্তার পাশের নর্দমার পানি ভরা খাদের কাছে পৌঁছাল, সিত্রোঁর গিয়ার তখন চতুর্থতে, স্পিড ঘণ্টায় সত্তর মাইল। রানার হাতের ভিতর শেষ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল হুইল, পরমুহূর্তে শূন্যে উঠে পড়ল গাড়ি, তির্যক একটা পথ ধরে উড়ছে, বুইকটাকে দেখা যাচ্ছে সরাসরি ওদের সামনে।

দুটো গাড়ির গা ঘষা খেল। সাইড মিরর আর দরজার হাতলগুলো ভেঙে

বেরিয়ে গেল। নাদিয়ার পাশের সেফটি গ্লাস ফেটে মাকড়সার জাল হলো। রানা অবশ্য তাকায়নি।

সিত্রোঁ তারপরেও ষাটে ছুটছে, লড়ছে কংক্রিট কামড়ে রাস্তায় থাকবার জন্য। থার্ড গিয়ারে নামো, দিক সংশোধন করো, পাম্প কোরো না, পাওয়ার সাপ্লাই দাও, দিক আবার শোধরাও, আরও পাওয়ার, সিধে করো গাড়ি। রানার নির্দেশ পেয়ে মাথা, চোখ, হাত আর পা চলছে যেন একই সুরে বাঁধা। মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্টের মত পরস্পরকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ক্লান্তিকর বহু সময় বিসিআই-এর ড্রাইভিং কোর্সে কাটানোর পরও এই সমর্থন আদায় করা সাবলীল আর সুষ্ঠু হলো না। দরকার হলো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, কী ঘটতে যাচ্ছে এক পলক আগে বোঝা, কখনও বা ইন্সটিঙ্কট-এর চেয়ে বেশি ডিসিপ্লিন। তবে সিত্রোঁ অবশ্য সোজা হলো।

চুল থেকে কাঁচের টুকরো ঝেড়ে রানার দিকে একবার তাকাল নাদিয়া। তারপর ব্যর্থ চেষ্টা করল নিজের দিকের জানালাটা নামাবার।

দরজা তুবড়ে যাওয়ায় পুলি ভেঙে গেছে, ফলে জানালা নামল না। বাধ্য হয়ে জুতো পরা পা দিয়ে মাকড়সার জাল হয়ে যাওয়া কাঁচ ভেঙে ফেলল নাদিয়া।

'ওদের গাড়ি খাদের নীচে, উল্টে পড়ে আছে,' জানালার বাইরে থেকে মাথাটা টেনে নিয়ে রিপোর্ট করল নাদিয়া।

'জানি।'

এক মিনিটের জন্য গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল নাদিয়া। কপালের পাশে খুদে একটা লালচে দাগ দেখা যাচ্ছে, অন্যমনস্কভাবে সেটায় মাঝে মধ্যে রুমাল চেপে ধরছে। তারপর যখন সিগারেট ধরাল, দেখা গেল তার হাত দুটো রানার মতই স্থির।

কোন মেয়ে সাধারণত এত শক্ত নার্ভের হয় না।

'একটা কথা, নাদিয়া।'

'বলো।'

'স্বামী না সন্ন্যাসী-কার কথা যেন বলছিলে...'

'তিনি আসলে একজন ভগবান...তো তাঁর সম্পর্কে কী?'

'কোথায় থাকেন তিনি? আমার কথা তাঁকে তুমি জিজ্ঞেস করবার সময়ই বা পেলে কখন?'

'তিনি কোথায় আছেন বা থাকেন, এটা একটা গোপন রহস্য, আরসালান। প্লিজ, এ-ব্যাপারে তুমি আমাকে আর কোন প্রশ্ন কোরো না। তবে সময় পেয়েছি, আর তোমার কথা তাঁকে বারবারই জিজ্ঞেস করেছি। প্রতিবার তিনি একই জবাব দিয়েছেন–তোর সঙ্গে এই লোকের ভালই বন্ধুত্ব হবে। কিন্তু...'

'কিন্তু?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'কিন্তু...কী?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নাদিয়া। 'দুঃখিত, সেটা তোমাকে বলা চলে না।'

ছয়

'নাদিয়া গারফিল্ড সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট নেই। প্রথম কথা, মেয়ে মাফিয়োসো সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, গারফিল্ড সিসিলিয়ান নাম নয়। আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রে এক কি দু'জন মেয়ের নাম পাওয়া যায়, কোনটারই তেমন কোন তাৎপর্য নেই।'

বিসিআই-এর রেডিও ট্র্যান্সমিশন রীতিমত হতাশ করছে রানাকে। ওর চারদিকে নাকের কোন অভাব নেই, কম বেশি সবগুলো সিটকাচ্ছে বা কোঁচকাচ্ছে। খাঁচার ভিতর হাজার হাজার খরগোশ, চকচকে গোল চোখ মেলে দেখছে ওকে। দুর্গন্ধটা মারাত্মক, মাঝে-মধ্যে রানার নাকও জীবন্ত হয়ে উঠবার ভঙ্গি করছে।

ওকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, তুরস্কে ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদ অত্যাধুনিক রিসিভিং সেট ব্যবহার করায় এবং ওখানে ন্যাটোর একটা কমান্ড পোস্ট থাকায় ঢাকা থেকে ইস্তাম্বুলের রেডিও নেটে শক্তিশালী সিগনাল পাঠানো অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার। টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, টেলেক্স—কোনটাই নিরাপদ নয়। তাই রানা এজেন্সির ইস্তাম্বুল শাখার সেফ হাউসে বিরাট একটা অ্যান্টেনা বসানো হয়েছে। মাটির তলায় গোলকধাঁধার মত যে-সব টানেলে খরগোশ পোষা হয়, তারই একটায় লুকানো আছে রিসিভারটা। বলাই বাহুল্য যে, ওই টানেলের সমষ্টিই ইস্তাম্বুলের সেফ হাউস।

আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু গন্ধটা অসহ্য।

'নাদিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ মাফিয়োসোর মেয়ে, তোর এই থিওরি কিন্তু কমপিউটার সমর্থন করছে না,' বলল সোহেল। 'মাফিয়া পরিবারের মেয়েরা কখনোই ব্যবসার সঙ্গে জড়ায় না।'

'কচু জানিস তুই!' ধমকের সুরে প্রিয় বন্ধুকে বলল রানা। 'অনেক কটা মাফিয়া পরিবারের মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা ছিল। এখনও আছে।'

'তবে "সৈনিক" হিসেবে নয়। আমাদের বিশ্লেষণে, এই মেয়েটা সম্ভবত প্রফেশনাল ক্রিমিনাল, শুধু এই কাজটার জন্যেই তাকে ভাড়া করা হয়েছে।'

'কমপিউটারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, মাফিয়া ফিমেল সম্পর্কে কোন গুজব বা রেকর্ড আছে কি না।'

তিন মিনিট পর উত্তর দিল সোহেল। 'মাস কয়েক আগের একটা ঘটনা। ডমিনিক ডানকানের কথা মনে আছে তোর? লাভার বয় নামে পরিচিতি পেয়েছিল? ওয়েস্ট কোস্টের একজন কাপ্তান। তার লাশ পাওয়া গেছে সৈকতে।'

'পানিতে চুবিয়ে মারা হয়েছে, অনন্যর মত?'

'না। মারা হয়েছে বিষ দিয়ে। ক্যানথ্যারিডিন। শেষবার তাকে সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তবে বিশ্বাস করা কঠিন যে কোন মেয়ে এ-ধরনের

কাণ্ড করতে পারে। আর কিছু?'

'খোঁজ নিয়ে দেখ ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি এখন কোথায়,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

টানেলের উপর উঠে এসে তাজা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল রানা। ভাবল, এরপর কোন ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁয় ঢুকে খরগোশের অর্ডার দিতে গেলে আজকের এই অভিজ্ঞতার কথা অবশ্যই মনে পড়বে ওর।

নাদিয়া রয়েছে ল্যানসিয়ায়। সিট্রোঁ ফেলে ট্রেনে চড়ে ইজমির ত্যাগ করেছে ওরা, ইস্তাম্বুলের তিন স্টেশন আগে ট্রেন থেকে নেমে ল্যানসিয়াটা চুরি করেছে।

মিউজিশিয়ানরা যে সিট্রোঁর লাইসেন্স নম্বর টুকে রেখেছে, এ-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া, লাইসেন্স প্লেট বদলালেও, এক পাশ তোবড়ানো একটা সিডান খুঁজে বের করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।

ল্যানসিয়া চুরি করবার বুদ্ধিটা রানার হলেও, উৎসাহ দেখিয়ে মূল কাজটা নাদিয়া নিজেই করেছে। কাজটায় তার দক্ষতা দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারেনি রানা।

ল্যানসিয়ায় শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিচ্ছে নাদিয়া, সেই ফাঁকে রানা এজেন্সির ইস্তাম্বুল শাখার সেফ হাউসে এসে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। তুরস্কে শুধু যে মোসাদ আর ন্যাটো সামরিক জোটের তৎপরতা খুব বেশি, তা নয়, এখানকার ড্রাগ লর্ডরাও অত্যন্ত সতর্ক; রানা এজেন্সি তাই বাধ্য হয়ে ইস্তাম্বুলের ঘিঞ্জি এলাকার ভিতর, মাটির তলায় খরগোশের কলোনিতে সেফ হাউস রাখতে বাধ্য হয়েছে। এরকম কলোনি এই এলাকায় প্রচুর আছে।

রওনা হওয়ার সময়ই রানা নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিল, নাদিয়া ওকে অনুসরণ করছে না। আশপাশে কোন ফোনও নেই, কাজেই অনুসরণ করবার দায়িত্ব আর কারও ঘাড়ে চাপাবার সুযোগও ছিল না নাদিয়ার।

একটা হিউম্যান হলারে বাদুড়-ঝোলা হয়ে ল্যানসিয়ার কাছে ফিরবার সময় রানা চিন্তা করছে। ক্যানথ্যারিডিন, তাই না? মৌমাছির মত এক ধরনের পোকা, কামড়ালে ফোস্কা ওঠে। ওটার আরও একটা নাম আছে—স্প্যানিশ ফ্লাই। স্প্যানিশ ফ্লাই অ্যাফ্রোডিজিয়্যাক, যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। উন্নত বিশ্বের হাই স্কুলে পড়ুয়া ছেলেরা পর্যন্ত সবজান্তার ভঙ্গিতে স্প্যানিশ ফ্লাই-এর অবিশ্বাস্য ক্ষমতা সম্পর্কে ফিসফাস করে—কীভাবে তারা এক বন্ধুর বন্ধু, তস্য বন্ধু সম্পর্কে শুনেছে, যে নাকি তার গার্লফ্রেন্ডকে স্প্যানিশ ফ্লাই দিয়েছিল, এবং সবশেষে পুলিশ এসে মেয়েটিকে গিয়ার লিভার থেকে টেনে তোলে।

সন্দেহ নেই ক্যানথ্যারিডিন যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তবে সেটা প্রথমদিকে, তারপরই শুরু হয়ে যায় মুখের ভিতর জ্বালা-পোড়া, গা ঘিন-ঘিন করতে থাকে, রক্তবমি হয়, ঢোক গেলা কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যথা করে উরুসন্ধি, প্রস্রাবে রক্ত যায়, ডায়রিয়া হয়, তারপর কোমা। খুব বেশি নয়, মাত্র বারো রতি মৃত্যু ডেকে আনবার জন্য যথেষ্ট।

একটা মেয়ে কোন পুরুষকে এই পরিমাণ স্প্যানিশ ফ্লাই দেবে না। দেওয়া উচিত নয়।

নাদিয়া কি দেবে?

ল্যানসিয়ার কাছে ফিরে এসে রানা দেখল, সদ্য ঘুম থেকে জেগে আড়মোড়া ভাঙছে মেয়েটা। রানাকে দেখে হাসল, জানতে চাইল, 'আমাদের ভবিষ্যৎ কী বলো তো?'

'উজ্জ্বল।' রানাও হাসছে। 'চলো, ফার্স্ট ক্লাস একটা হোটেলে উঠে শাওয়ার সেরে খাইদাই, বিশ্রাম নিই; তারপর অন্য কোন দেশে বেড়াতে যাই। রাজি?'

'রাজি। তবে জানতে চাই সেই দেশটা কোথায়।'

'সেটা জানতে পারবে প্লেনের টিকিট কেনার পর।'

'আচ্ছা, বাবা, বেশ,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল নাদিয়া। 'কিন্তু তোমার না প্রচুর পরিমাণে কী একটা সংগ্রহ করার কথা?'

হাসল রানা। 'সেটা আমার মাথাব্যথা। তুমি শুধু এটুকু জেনে রাখো, যা কিছু ঘটবে, সবই তোমার চোখের সামনে। তারপরও কী ঘটছে বুঝতে না পারার কোনও কারণ দেখি না। আর কেউ হলে আসল সময়গুলোতে তাকে সঙ্গে রাখতাম না, কিন্তু তোমাকে রাখব। নিশ্চিন্ত থাকো, রিপোর্ট করবার মত প্রচুর মালমশলা পাবে।'

সরু ঠোঁটের একটা কোণ একটু বাঁকা করল নাদিয়া। 'নিজের বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে, আরসালান। ঠিক আছে, প্রশ্ন করে আর বিরক্ত করব না।'

'দ্যাটস্ গুড।'

সাগরতীরের সফেদ ফেনায় কিলবিল করছে রোদে পোড়া বাদামি কয়েক ডজন শরীর। কোন জাহাজডুবির রক্ষা পাওয়া লোকজন নয় ওরা, আমেরিকা থেকে আসা ট্যুরিস্ট। জায়গাটা জিব্রাল্টার প্রণালীর কাছাকাছি। সৈকতটা পর্তুগিজ শহর আলবুফেইরা-য়।

ত্রিশ বছর আগে আলবুফেইরা ছিল জেলেদের একটা অখ্যাত গ্রাম। সৈকতে ঝাঁক-ঝাঁক ইঞ্জিনবিহীন নৌকা দেখা যেত। জেলেদের পরনে ছিল ছেঁড়া কাপড়। দু'বেলা খেতে পেত না পেট ভরে।

আজ সেই জেলেদের ছেলেরা গাঢ় রঙ করা বোট চালিয়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরছে, প্রতিদিন তেল পোড়াচ্ছে একশো ডলারের, মাছ বেচে দৈনিক আয় করছে খরচ-খরচা বাদে কমপক্ষে তিনশো ডলার।

তবে জেলেদের সেই গ্রামটা আর নেই। তার জায়গায় সারি সারি ফাইভ স্টার হোটেল আর হরেক রকম রিসর্ট সেন্টার গজিয়েছে। গোটা উপকূল রেখা জুড়ে এই একই দৃশ্য। যেখানে সৈকত সেখানেই ছুটি কাটানোর লোভনীয় সব আয়োজন–নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন পরিবেশ পেয়ে দুনিয়ার ধনী লোকেরা দু'হাতে টাকা ওড়াতে ছুটে আসছে।

বলা হয় যে-দেশের কপালে সাগর জুটেছে, সহজে সৈকতে পৌঁছানো যায়, সে-দেশের অর্থনীতি আপনাআপনি তাজা হয়ে উঠবে।

বঙ্গসন্তান মাসুদ রানাকে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে হলো। কারণটা

পরিষ্কার–অর্থনীতি তাজা হয়ে উঠবার ওই কথাটা বাংলাদেশের জন্য খাটে না। অথচ দুনিয়ার দীর্ঘতম সৈকত রয়েছে ওখানেই। কথাটা বোধহয় সত্যি–উদ্ভট এক জন্তুর পিঠে তুলে দিয়ে দেশটাকে পিছনে ঠেলে নিয়ে চলেছে একদল অর্ধশিক্ষিত উন্মাদ।

রিসর্ট হোটেলের একটা মজা হলো, দু'জন একটা স্যুইট ভাড়া নিতে চাইলে জিজ্ঞেস করা হয় না তারা বিবাহিত কিনা। রুম সার্ভিসের আচরণেও কোন রকম অনুযোগ বা কটাক্ষ নেই। যে মেইড ওদেরকে ড্রিঙ্ক দিয়ে গেল সে বোধহয় খেয়ালই করেনি যে সোফায় আধ শোয়া অবস্থায় পড়ে থাকা নাদিয়ার পরনে আসলে কিছু নেই, অর্থাৎ চাদরের নীচে কিছু পরেনি সে।

'ব্রেকফাস্ট হিসেবে ভদকা আর লেমোন জুস? ভগবান রাত্রি শুনলে ভীষণ রেগে যাবেন।'

ওরা ইস্তাম্বুল ছেড়ে এসেছে আজ পাঁচ দিন। এই পাঁচ দিন শুধু মাইলের পর মাইলই পার হয়নি ওরা, দু'জনের মাঝখানের বাধাগুলোও এক এক করে পার হয়ে এসেছে। "তোমাকে ভালবাসি"–এরকম কোন কথা রানার মুখ দিয়ে তো বেরোবেই না, নাদিয়ার তরফ থেকেও উচ্চারিত হয়নি; তবে বাস্তব ক্ষেত্রে সে প্রমাণ করে দিয়েছে তার ভালবাসায় কোনও খাদ নেই। মেয়েটাকে ভালই লাগছে রানার, কিন্তু কিছুটা বিভ্রান্ত ও; ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কেন হৃদয়টা এমন ভাবে উন্মোচন করছে মেয়েটা–যেখানে সবাই জানে, প্রত্যাখ্যান পেলে ওখানটাতেই লাগে সবচেয়ে বেশি।

নাদিয়ার সান্নিধ্যে রানাও এখন অভ্যস্ত। মেয়েটাকে ভাল লাগছে ওর, তবে তা শুধু অপরূপ সুন্দরী বলে নয়। আশ্চর্য একটা ঠাণ্ডা, দৃঢ়, প্রশান্ত আর সকৌতুক ভাব রয়েছে ওর মধ্যে, যার আকর্ষণ এড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। মাঝে-মধ্যে মনে হয়, মেয়েটা ওকে নিয়ে খেলছে। ভগবান রাত্রি বা রাজীব ত্রিপাঠির প্রসঙ্গ সময়ের একটা নিয়মিত ব্যবধানে তুলবার কী মানে থাকতে পারে?

একবার কথা প্রসঙ্গে জানাল, সেই মিউজিশিয়ানদেরকে যে বৈরী ডন পাঠিয়েছিল, তাকে টেলিফোন করে বলে দিয়েছে, তারা যেন আর ওদেরকে অনুসরণ না করে। অর্থাৎ, ও সেই ডনের অধীনস্থ কেউ নয়। তাহলে কে ও?

'ডমিনিক ডানকানকে তুমি চেনো? ওই যে, লাভার বয়?' গতরাতে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল রানা।

রানার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে নাদিয়া, 'চিনি বলা উচিত নয়–চিনতাম। বেচারি মারা গেছে।'

'কীভাবে মারলে তাকে?'

নাদিয়া চমকায়নি, রেগেও ওঠেনি। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিল, 'যেভাবেই মারি, তোমার তাতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমার গুরু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে না।'

'এভাবে ভবিষ্যৎ বলে দেয়াটা কেমন বলো তো! পঁচাত্তর ভাগ মজাই তো মাটি হয়ে গেল। তবে ঠিকানা জানলে তোমার ওই গুরুর কাছে যেতাম, জিজ্ঞেস

করতাম–আমার হাতে তোমার মৃত্যু আছে কি না।'

'নেই। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'তবে গুরুর ভবিষ্যদ্বাণীতে একটা "কিন্তু" আছে।'

'হ্যাঁ।' রানার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল নাদিয়া। 'তবে সেটা কী, তোমাকে বলা চলে না–অন্তত এখনই নয়।'

ব্যাপারটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। বোঝাই যায়, রানার প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ অস্থির করে তুলছে মেয়েটাকে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না, এই ভয়ে মদ খেয়ে নেশা করছে সে। রানার মনে হচ্ছে কোথায় যেন মারাত্মক কোনও জখম রয়েছে মেয়েটার মধ্যে।

এর জন্য ভগবান রাত্রি, অর্থাৎ নাদিয়ার গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী কি কিছুটা দায়ী?

'লেমোন জুসে প্রচুর ভিটামিন আছে,' বলল রানা। 'তোমার গুরুর জানার কথা আমেরিকানরা ভিটামিন নিয়ে কেমন মাতামাতি করে।'

'তুমি দেখা যাচ্ছে আমেরিকানদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো,' বলল নাদিয়া। 'কিন্তু আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিছু বলবে নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটাকে ঝেড়ে ফেলল রানা, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর।

'তুমি রহস্যময় আর রোমান্টিক হবার চেষ্টা করছ,' অভিযোগ করল নাদিয়া।

'আরে, না। আমি অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল মানুষ–রোমান্টিক তো নই-ই, কাউকে আকর্ষণ করার মত রহস্যও নেই আমার মধ্যে।'

'তাহলে নিজের সম্পর্কে কিছু বলছ না কেন?'

হাসল রানা। 'বলা উচিত নয়, তাই বলছি না। বলি, আর তুমি আমার গলাটা ফাঁক করে দাও আর কী!'

'তোমার ইংরেজি খুব ভাল। কোত্থেকে শিখেছ? ধনী কোন আমেরিকান সুন্দরীর কাছে?'

'নাদিয়া, কেউ যদি আমেরিকান ডলার কামাতে চায়, ইংরেজি তাকে শিখতেই হবে।'

'আচ্ছা, তোমার তা হলে প্রচুর টাকা দরকার। না কি টাকা কামানোর থ্রিলটা?'

'আগে টাকার ঠিকানায় পৌঁছাই, তারপর দেখতে পাবে থ্রিল কাকে বলে।'

ওদের বাহন এখন একটা মার্সিডিজ। এক ঘণ্টা পর আলবুফেইরার আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ছুটল সেটা। সাগর ঘেঁষা রাস্তার ধারে সারি সারি আইরিস গাছে সাদা আর নীল ফুল ধরেছে। ঘোড়ায় টানা কয়েকটা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, ভূত-প্রেতের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য উজ্জ্বল রঙ দিয়ে নানরকম চিহ্ন আঁকা ওগুলোর গায়ে।

এরপর একটা সাইড রোড ধরল মার্সিডিজ। খেতে দাঁড়িয়ে মেয়েরা পাকা ধান তুলছে। ওরা যেন আঠারো শতকে ফিরে এসেছে। অগভীর পানিতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অসতর্ক মাছের প্রতীক্ষায় রয়েছে বক।

রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। খেত আর জলাভূমি থেকে অনেক উপরে

উঠে এল ওরা। চারদিকে এখন ঢেউ খেলানো পাহাড় আর পাহাড়; আসলে এটাই পর্তুগালের আসল চেহারা বা বৈশিষ্ট্য। ধূসর-সবুজাভ জমিনে মোচড় খাওয়া কর্ক গাছগুলোর ছায়া ভৌতিক লাগে।

নাদিয়া অকস্মাৎ উল্লসিত, তাকিয়ে আছে দূরে। 'ওটা আমি কী দেখছি? তুষার?'

দূরের পাহাড়ে সাদা একটা চাদর গ্রীষ্মের রোদে ঝিলমিল ঝিলমিল করছে।

'মুসলমানদের পুরানো একটা গল্প শোনো,' বলল রানা। 'তখন স্পেন শাসন করত আরবরা। আরবের এক রাজপুত্র এক ভাইকিং প্রিন্সেসকে বিয়ে করে বসবাস করতে চলে এল স্পেনে। কিন্তু প্রিন্সেসের মন দিনে দিনে শুধু খারাপই হচ্ছে। কারণ জানতে চাইলে নতুন বউ বলল, জন্মভূমির কথা মনে পড়ছে তার, বিশেষ করে তুষারের অভাব খুব কষ্ট দিচ্ছে তাকে, কিছুদিনের জন্যে হলেও সে দেশে যেতে চায়। বউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, তাই রাজপুত্র তখন স্পেনে আমন্ড অর্থাৎ বাদাম গাছ লাগাল–সেই গাছের তুষারের মত সাদা ফুলে ছেয়ে গেল সারা স্পেন, এমনকী পর্তুগালও।'

'আমন্ড গাছ,' নরম সুরে প্রতিধ্বনি তুলল নাদিয়া।

মৃদু গুঞ্জন তুলে মার্সিডিজ ওদেরকে যে জিনিসটার দিকে তুলে নিয়ে এল প্রথমে সেটাকে মরীচিকা কিংবা মায়াবী হিমবাহ বলে মনে হলো। তারপর ওরা বেড়া দেওয়া বাগানগুলোর কাছে পৌঁছাল। চারপাশ থেকে ওদেরকে ঘিরে আছে ঝিলমিলে সাদা পাপড়ি।

গাছে গাছে ঝুলন্ত তুষারের বিপরীতে নাদিরাকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। রানার মুগ্ধ দৃষ্টি মেয়েটির চোখ এড়াল না।

মাইলের পর মাইল পার হয়ে এল ওরা, আমন্ড বাগান যেন শেষই হতে চাইছে না। অবশেষে এক ঝাঁক দালানের দেখা মিলল–গ্যারেজ, কারখানা, সাইলো আর অফিস।

গাড়ি থামিয়ে অফিসে ঢুকল ওরা। পুরানো সুট পরা এক আধ বুড়ো লোক অভ্যর্থনা জানাল রানাকে।

'হের ডাফম্যান?'

'না, আমি সিনর আরসালান। ডাফম্যান ওবারসি থেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে। আপনি আমাদের অর্ডার অনুযায়ী মাল রেডি করেছেন?'

'জী, জী, সব রেডি।'

'এই নিন বাঙ্কো ডো লিসবোঁ-র চেক–পুরো এক রেলকার ভর্তি আমন্ড পাউডারের দাম। কিছু যদি মনে না করেন, ওই পাউডার এখন আমি দেখতে চাইব।'

'জী, আসুন। নিশ্চয়ই!'

সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল সব সাইলোর দিকে হেঁটে এল ওরা। তিন নম্বর সাইলোর সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের গাইড হাত তুলে আধ ভরা বেশ কিছু কার্ডবোর্ড ব্যারেল দেখাল রানাকে। ভিতরের আমন্ড পাউডার থেকে চমৎকার একটা সুগন্ধ বেরুচ্ছে। সরাসরি তাকায়নি বলে রানা দেখতে পেল

না, তবে নাদিয়ার চোখের প্রশংসাসূচক দৃষ্টি অনুভব করতে পারছে ও। ওই সুগন্ধটা বাদে, আমন্ড গুঁড়ো আর আফিম গুঁড়োর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন রকম পার্থক্য নেই। দুটোই বাদামী রঙের।

'আপনি বরং চেকটা আমাকে ফেরত দিন,' আধ বুড়ো লোকটাকে বলল রানা। 'এই পাউডার আমি নেব না।'

'নেবেন না...মানে?' ঘাবড়ে গেল লোকটা।

'বড় আকারের ট্র্যান্সপারেন্ট প্লাস্টিক ব্যাগগুলো বুঝেশুনেই পাঠিয়েছিলাম আমরা, আপনারা যাতে শুধু ওগুলোতেই পাউডার ভরেন।'

'কেন, ব্যারেলে ভরাটা কী এমন অশুদ্ধ হয়েছে?'

'সমস্যাটা হলো, প্রতিটি সীমান্তে কাস্টমস অফিসাররা চেক করার জন্যে কার্ডবোর্ড ভেঙে বাক্স খুলবে। ফলে দূষণের কারণে দশ পার্সেন্ট মাল কমে যাবে আমাদের।'

'তবে কাস্টমস কিন্তু ব্যাগও খুলবে,' প্রতিবাদের সুরে বলল লোকটা।

'সেজন্যেই প্রতিটি ব্যাগের সঙ্গে ইলাস্টিক ব্যান্ড দেয়া হয়েছে। আমাদের কোম্পানি ডাফম্যান ওবারসি বেনিফিট এভাবেই কাজ করে। আপনার বোঝা উচিত ছিল।'

'ভুল হয়ে গেছে, সিনর,' বলল লোকটা। 'একটু সময় দিন, শুধরে নিচ্ছি।'

কাজের লোকদের ডাকল সে, প্লাস্টিক ব্যাগগুলো কোথায় আছে খুঁজে বের করতে বলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাওয়া গেল সেগুলো। ব্যারেল থেকে ব্যাগে ভরা হলো পাউডার।

'ফ্রেইট কার আলবুফেইরা রেল ইয়ার্ডে অপেক্ষা করছে। আশা করছি, আজ রাতের ট্রেনের সঙ্গেই রওনা হবে ওটা। কাজেই আপনি সন্ধ্যার আগে লোড করবেন।'

'জী, ঠিক আছে।'

'এই চালানটা যদি ঠিকমত সামলাতে পারেন, ভবিষ্যতে ডাফম্যান ওবারসির আরও অনেক কাজ পাবেন আপনারা।'

উৎসাহ দেখিয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'জী-জী।'

'ওয়ান্ডারফুল!' পাহাড় থেকে গাড়ি নিয়ে নামবার সময় রানাকে একটা চুমো দিল নাদিয়া। 'আমন্ড পাউডার সত্যি পারফেক্ট ম্যাচ–পুরোপুরি মেলে। কিন্তু বুঝতে পারছি না অদল-বদলটা কীভাবে করবে তুমি।'

রানা কথা বলছে না, মৃদু হাসল কেবল।

'তুমি বললে সীমান্তে ব্যাগগুলো চেক করা হবে। সত্যি হবে। ওরা আফিমের খোঁজে তল্লাশী চালাবে। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাগ থেকে নমুনা নেবে ওরা।'

'ঠিক। আমি চাই নিক।'

'বেশ, তা হলে আফিম তুমি কোথায় লুকাবে?'

'লুকাব না।'

আমন্ড বাগানের ভিতর দিয়ে আরও এক মিনিট ছুটল মার্সিডিজ, তারপর নাদিয়ার মাথায় চিন্তাটা খেলল। 'তুমি বলতে চাইছ, আমরা পর্তুগালের ভেতর

দিয়ে আফিম আনছি না?'

'আমি কখনোই বলিনি যে আনব।'

'কিন্তু, আমি ভেবেছিলাম... ভুরু কোঁচকাল নাদিয়া। বাতাসে তার লালচে চুল পতাকার মত উড়ছে। 'তা হলে আমরা এখানে কেন? পর্তুগালে কী করছি?'

'কেন, গাছে গাছে তুষার তোমার ভাল লাগছে না আর?'

হীরের আঙটিটা নার্ভাস ভঙ্গিতে চিবুকে ঘষল নাদিয়া। তারপর সিগারেট ধরাল।

একটা রেস্তোরাঁর সামনে থেমে লাঞ্চ সারল ওরা। নাদিয়া এখনও বিশেষ কথা বলছে না।

'কী হয়েছে তোমার? খুব অসুখী দেখাচ্ছে।'

'অসুখী নই।' আঙুল দিয়ে রানার হাত ছুঁলো নাদিয়া। 'খুব চিন্তিত।'

'বিষয়?'

'তুমি। মাঝে-মধ্যে তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

'কী রকম?'

'ডন আলবার্ট ডি' মোনা যদি জানতে পারে দশ লাখ ডলারের আমন্ড পাউডার পেয়েছে সে, অন্য কিছু নয়, জানি না তোমাকে নিয়ে কী করবে সে। স্বস্তি বোধ করি শুধু যদি এটুকু বলো যে আফিমটা তুমি কীভাবে আনছ। অস্বীকার কোরো না, ব্যাপারটার সঙ্গে আমিও এখন জড়িয়ে পড়েছি–তোমার বিপদ-আপদের দিকগুলো আমাকেও খতিয়ে দেখতে হবে।'

'নাদিয়া, স্বস্তি বোধ করতে চাইলে আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, নইলে আরও একটু বেশি করে মদ খাও। কিংবা তোমার গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শও চাইতে পারো। সিস্টেমের কথা যদি বলো, ওটা নিয়ে মোটেও চিন্তা কোরো না। সব যেভাবে চলা উচিত, সেভাবেই চলছে।'

'তোমার মধ্যে দেখছি আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই।'

'কোনকালে ছিল না।' গ্রিন ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। তারপর যোগ করল, 'বোকাদের থাকেও না!'

বিকেলের দিকে নিজেদের হোটেলে ফিরে এল ওরা। আকাশে সোনালি বল হয়ে রয়েছে সূর্যটা, রানা সিদ্ধান্ত নিল সুইমসুট পরে আবার বেরুবে ওরা, নিরিবিলি ছোট একটা প্রাইভেট খাঁড়ি খুঁজে নিয়ে মনের আনন্দে সাঁতার কাটবে।

'হাত-মুখটা ধুয়ে নিই, দাঁড়াও,' স্যুইটের তালা খুলতে খুলতে বলল নাদিয়া। দ্রুত পা চালিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

রানা বেডরুমে ঢুকে বিছানায় লম্বা হলো, পা দুটো খাটের বাইরে ঝুলছে।

শব্দটা শ্যাম্পেনের বোতল খুলবার সঙ্গে মেলে, এল বাথরুম থেকে, তবে আরও দশগুণ বেশি জোরাল।

ঝট্ করে মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, চোখের পলকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা।

বাথরুমের দরজা খুলে গেল, কার্পেটের উপর সটান মুখ থুবড়ে পড়ল একজন লোক। তার হাতে হেভি ক্যালিবারের একটা পিস্তল রয়েছে। পিঠের মাঝখানে

ছোট একটা গর্ত আর পাউডার বার্ন দেখা যাচ্ছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল নাদিয়া। চুল এলোমেলো হয়ে আছে, লিপস্টিক ঠোঁটের আশপাশেও লেপ্টানো। হাতে একটা বেরেটা পয়েন্ট টু-টু, বলাই বাহুল্য যে, তার টয়লেট সামগ্রীর একটা অংশ ওটা।

'কে ও, নাদিয়া?'

'জানি না। শাওয়ারের ওপাশে অপেক্ষায় ছিল, পরদার আড়ালে।' লোকটার পাশে হাঁটু গাড়ল সে। লাশের চুল ধরে উঁচু করল মাথাটা। চৌকো মুখ। বিস্ময়ের ধাক্কায় চোখ দুটো কোটর ছেড়ে এখনও যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'কর্সিকান। এর মানে হলো, তোমার প্রতিযোগীরা চুপ করে বসে নেই।'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে। তুমি বোধহয় আমার প্রাণ বাঁচালে। গুলিটা...কী বলব...মোক্ষম ছিল।' অনুচ্চারিত প্রশ্নটা হলো, 'কর্সিকান লোকটা কি এতই বোকা ছিল যে অচেনা কারও দিকে পিছন ফিরল, যাতে নাদিয়া তার শিরদাঁড়ায় গুলি করবার সুযোগ পায়?'

'রানা, এখান থেকে এখনই আমাদের কেটে পড়তে হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে লাশের একটা ব্যবস্থা করতে হবে না? প্রতিদ্বন্দ্বীরা পিছনে লেগেছে, এরপর পুলিশও যদি ধাওয়া করে, সামলাতে পারব?'

লাশের ক্ষত থেকে রক্তের চেয়ে রসই বেশি বেরুচ্ছে। বুলেটটা বুক ফুঁড়ে বাইরেও বেরোয়নি। গুলির আওয়াজ নিয়ে চিন্তিত নয় রানা। ছোট ক্যালিবার পিস্তলের শব্দ এক হাজার লোকের মধ্যে মাত্র একজন চিনতে পারে।

'ক্লজিট থেকে বিচ রোবটা বের করো। রুম সার্ভিসকে ডাকছি আমি।' ইন্টারকমের রিসিভার তুলে তিনটে ড্রিঙ্ক আর একটা হুইল চেয়ার চাইল রানা।

'মানে? কী করতে চাও তুমি?' রোবটা এনে রানার হাতে ধরিয়ে দিল নাদিয়া। 'ভেবে দেখেছ, ওর বন্ধুরা হয়তো বাইরেই অপেক্ষা করছে।'

'ওর বন্ধুদের সামলাবে আমার বন্ধু,' বলল রানা। 'বলতে চাইছি, তুমি সঙ্গে থাকতে আমার চিন্তা কী!'

লাশটাকে কিছুক্ষণ রোব দিয়ে ঢেকে রাখা হলো। রুম সার্ভিস ফিরে যাওয়ার পর হুইলচেয়ারে বসানো হলো সেটাকে, তারপর বেল্ট দিয়ে এমনভাবে বাঁধা হলো যাতে কাত হয়ে পড়ে না যায়।

এরপর রানা লাশের হাত থেকে তার পিস্তলটা ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করল। হাতে থাকলেও, ওটা থেকে কোন গুলি হয়নি।

ক্রিমিনালরা অনেক সময় হত্যাকাণ্ডকে আত্মহত্যা বলে চালাবার জন্য ভিক্টিমের হাতে নিজেদের অস্ত্র গুঁজে দেয়। কিন্তু পুলিশকে তাতে বোকা বানানো যায় না, কারণ লাশ নাড়াচাড়া করা মাত্র অস্ত্রটা হাত থেকে খসে পড়ে। পড়ত না, মৃত্যুর মুহূর্তে যদি হাতে ধরা থাকত ওটা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেশি সঙ্কুচিত হয়ে ইস্পাতের মত শক্ত করে তোলে হাতকে।

হাতটা সামান্য একটু ফাঁক করে অস্ত্রটা বের করে নিল রানা, তার জায়গায় ঢুকিয়ে দিল একটা গ্লাস।

'এরপর কী?' জিজ্ঞেস করল নাদিয়া, নার্ভাস।

'আমরা অপেক্ষা করব।'

সাধারণত রিগর মরটিস বা মরণসঙ্কোচ শুরু হতে সময় লাগে আট ঘণ্টা, তবে উত্তপ্ত পর্তুগিজ বিকেল প্রক্রিয়াটাকে দ্রুতগতি করে তুলবে। ধরে নেওয়া চলে অচেনা আগন্তুক ছ'ঘণ্টার মধ্যেই যথেষ্ট আড়ষ্ট হয়ে উঠবে।

কামরার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে সময়টা পার করছে নাদিয়া। মাঝে মধ্যে ধপাস করে আধ শোয়া হচ্ছে আরামকেদারায়, সিগারেট ধরিয়ে পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে, তারপর আবার হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে আছে রানা, কোলের উপর পিস্তল, নজর রাখছে দরজা আর ব্যালকনির দিকে। নাদিয়ার আশঙ্কা মিথ্যে না-ও হতে পারে—আরেকজন আগন্তুক ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। তবে বিষয়টা নিয়ে যত ভাবছে রানা, সে আশঙ্কা ততই ফিকে হয়ে আসছে।

'চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। এখন আমরা যেতে পারি না?' এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল নাদিয়া।

কর্সিকানের লাশ থেকে বেল্টটা খুলে নিল রানা। স্মার্ট একটা ভঙ্গিতে আগের মতই বসে থাকল ওটা, ঢলে বা কাত হয়ে পড়ে গেল না। তার জুতো খুলে পায়ে স্লিপার গলিয়ে দিল ও। ট্রাউজারের পায়া খানিকটা গুটানো হলো, গুটানো হলো জ্যাকেটের হাতাও। সবশেষে তার গ্লাসে নতুন কয়েক টুকরো বরফ ছাড়া হলো। লাশের মাথা আর কাঁধের বেশ কিছুটা আগেই জড়ানো হয়েছে রোব দিয়ে।

বলা যায় হঠাৎ করেই নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠল নাদিয়া। এখন তাকে এক টুকরো বরফের মতই ঠাণ্ডা লাগছে।

শুরু হলো ওদের বিপজ্জনক অভিনয়।

এলিভেটরে চড়ে নীচে নামতে কোন অসুবিধেই হলো না। আসল খেলা, নাচও বলা যেতে পারে, এখান থেকে শুরু। লবিতে বেশ ভাল ভিড়, তার ভিতর দিয়ে হুইলচেয়ারে বসা আড়ষ্ট বন্ধুকে নিয়ে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা।

হোটেলের মেট জানতে চাইল ওদের খাবার ঘরে পাঠাতে হবে কি না। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর যেন নাদিয়ার সঙ্গে যে-কথা বলছিল তার সূত্রটা ধরল আবার। তাই ওদের হুইলচেয়ার ঠেলায় কোনও সাহায্য লাগবে কি না, জিগ্যেস করতে গিয়েও থেমে গেল মেট।

চারপাশে লোকজনের অভাব নেই।

সোফায় বসে ট্যুরিস্টরা সানবার্ন লোশন সম্পর্কে টিপস্ বিনিময় করছে, ওদের দিকে তেমন খেয়াল নেই কারও। দরজা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ, পার হতে প্রচুর সময় লাগছে, ততক্ষণ নাদিয়াকে কৌতুক শোনাল রানা, নাদিয়াও হেসে খুন হলো সে-সব শুনে। মাঝে-মধ্যে হুইলচেয়ারে বসা লোকটার দিকেও ঝুঁকে তার কানে কানে কিছু বলবার ভঙ্গি করছে রানা। বোঝাতে চায়, ওদের হাসাহাসিতে সে-ও অংশগ্রহণ করছে।

বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। মার্সিডিজের ব্যাক ডোরটা খুলল নাদিয়া, খুব সাবধানে লাশটাকে ভিতরে ঢোকাল রানা। হুইল চেয়ার জায়গা পেল ট্রাঙ্কে। ওরা

দু'জন সামনে বসল। কেউ ওদেরকে থামাবার চেষ্টা করছে না।

আলবুফেইরা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে মার্সিডিজ। কেউ পিছু নেয়নি। বিশ মাইল পশ্চিমে চলে এল রানা। হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি থামাল একটা খাদের কিনারায়।

লাশের মাথা আর কাঁধ থেকে রোবটা খুলে নিল রানা। স্লিপারের বদলে মোজা আর জুতো পরাল পায়ে। ট্রাউজারের পায়া আর জ্যাকেটের হাতার ভাঁজ খুলে নীচে নামাল, শক্ত হাত থেকে গ্লাসটা বের করা অসম্ভব মনে হওয়ায় একটা পাথর দিয়ে টোকা মেরে ভেঙে ফেলল সেটা।

'তুমি যদি ওর পেটটা কেটে দাও, সমস্ত গ্যাস বেরিয়ে যাবে, তা হলে আর ভাসবে না পানিতে,' বুদ্ধি দিল নাদিয়া।

চাঁদের আলোয় তার মুখ কোমল আর মায়াময় লাগল, এই মাত্র বলা কথাগুলোর সঙ্গে ভয়ানক বেমানান। 'ভাসে ভাসুক,' বিড়বিড় করল রানা।

মৃতদেহ টেনে খাদের কিনারায় নিয়ে এল ও। ঝুঁকে নীচে তাকাল। কর্কশ দর্শন পাথরে সাদা ফেনা সহ আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। জোয়ারের পানি দ্রুত ফুলছে। চোখা সব পাথরে ঘন ঘন বাড়ি খেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে লাশটাকে আর চেনা যাবে না। একটা পা সামনে ঠেলে দিল রানা।

কালো একটা আকৃতি খসে পড়ল বিক্ষুব্ধ সাগরে। আধ ডোবা বোল্ডারগুলোর ভিড়ে হারিয়ে গেল সেটা।

'ঝামেলা শেষ। দু'একদিনের মধ্যেই অবশ্য কোনও জেলের জালে আটকা পড়বে, তবে তখন কেউ আর তাকে সনাক্ত করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হাসছে নাদিয়া, আনন্দে প্রায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'আরসালান, সত্যি, ভারী স্মার্ট একজন অপারেটর তুমি।'

'তবে তোমার মত অতটা স্মার্ট নই।'

একটু যেন ধাক্কা খেল নাদিয়া। 'কী বলতে চাইছ?'

'কেন, আমি তো শুধু লাশটা ফেলার ব্যবস্থা করেছি। খুনটা তো করেছ তুমি।'

সাত

পর্তুগাল থেকে স্পেনে চলে এল ওরা। সীমান্তে কাস্টমস চেকিং স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। বান্ধবী হিসাবে সঙ্গে সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী থাকায় তুরকি ফাহিম আরসালানের সঙ্গে একটু হয়তো সদয় ব্যবহারই করা হলো।

এরপর মোটরওয়ে ধরে গোটা স্পেন পাড়ি দিল ওরা। মার্সিডিজ ছুটল কখনও ঘণ্টায় সত্তর মাইলে, কখনও একশোয়। রাত্রি যাপন নিদেনপক্ষে থ্রি স্টার কোন হোটেলে। ভোর হতে না হতে আবার গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে দে ছুট।

তারপর আবার সীমান্ত। জায়গাটার নাম আইরান। পিরেনিয পার্বত্য

এলাকায় ওটা, স্পেন আর ফ্রান্সের মাঝখানে। গাড়ির লম্বা একটা লাইনে রয়েছে ওদের মার্সিডিজ, ফরাসী বর্ডার পেট্রল এক এক করে তল্লাশী চালাচ্ছে।

রানা ভাব দেখাল–ও যেন একঘেয়েমির শিকার একজন ব্যবসায়ী। নাদিয়া একটা ফরাসী পেপারব্যাকে নাক ডুবিয়ে দিয়েছে। দুপুরবেলার সূর্য ভয়ানক খেপে আছে। পাহাড়ী রোদেরও আলাদা তেজ। একটা কারের রেডিও থেকে আমেরিকান র‍্যাপ মিউজিক ভেসে আসছে।

সময়ের একটু হেরফের হতে পারে, রানার ফ্রেইট ভর্তি আমন্ড পাউডার এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরের অন্য এক পথ ধরে সীমান্তে পৌঁছেছে, উতরে যাচ্ছে বর্ডার ইন্সপেকশন। স্প্যানিশ আর ফ্রেঞ্চরা শুধু পাউডারের চেহারা দেখে সন্তুষ্ট হবে না। প্রতিটি ব্যাগ খুলবে তারা, পাউডারের গভীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে–একবার নয়, কয়েকবার, কারণ নীচের দিকে আফিমের উপর আমন্ড পাউডারের স্তর থাকতে পারে।

রানাও চায় খুব ভালভাবে চেক করা হোক। সব কিছু যতটা সম্ভব আইনসিদ্ধ হওয়া চাই।

তারমানে এখন, সীমান্ত পেরুবার সময়, ওদেরকে ঝুঁকি নিতে হবে। রানার চিন্তা স্প্যানিশ কাস্টমস নিয়ে নয়। ধরে নেওয়া চলে ইতোমধ্যে লাশটা উদ্ধার করেছে পর্তুগিজ পুলিশ। তবে সেই লাশের সঙ্গে এখনই ওদেরকে জড়াবার কোন সুযোগ নেই কারও। এমনও হতে পারে, কখনোই তা পারবে না।

তবে কর্সিকান পরিবার জানবে কী ঘটেছে। আর বিশেষ সমস্যাটা ওদের সেখানেই।

ফরাসী মাফিয়ায় কর্সিকানরা তো আছেই। ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্ক SDECE-তেও–বিশেষ করে ওদের কিলিং স্কোয়াডে আছে কাজের মধ্য দিয়ে নির্দয় পাষাণ হয়ে ওঠা বেশ কিছু কর্সিকান। এই কিলিং স্কোয়াডের নাম 'অ্যাকশন'।

অ্যাকশন কর্সিকা দ্বীপে ট্রেনিং নেয়। অ্যাকশনের কর্সিকানরা মার্সেই ড্রাগ লর্ডদের খুব ঘনিষ্ঠ; মাদক ব্যবসা বন্ধের সমস্ত চেষ্টা এতদিন ব্যর্থ হওয়ার পিছনে এটাও একটা প্রধান কারণ।

একজন কর্সিকানকে খুন করলে তুমি আসলে আত্মহত্যা করো, এটাই ফ্রান্সের অনুচ্চারিত বিধান। আর ঠিক সেই কাজটা করবার পর ফ্রান্সে ঢুকতে চলেছে ওরা।

স্প্যানিশ কাস্টমস অফিসাররা ওদের পাসপোর্ট, ভিসা, কার রেজিস্ট্রেশন আর বিমার কাগজ-পত্র নেড়েচেড়ে দেখে ফেরত দিল সব, ইঙ্গিতে সামনে এগোতে বলল।

এখান থেকে ফাঁকা হাইওয়ে ধরে মাত্র পঞ্চাশ গজ এগোলেই ফ্রেঞ্চ চেকপয়েন্ট। আবার ওরা নিজেদের কাগজ-পত্র দেখাল।

'প্লিজ, মশিয়ে, গাড়িটা একপাশে সরিয়ে আনবেন?' জিজ্ঞেস করল এক ফরাসী লোক।

'কেন?'

'রুটিন ইন্সপেকশন।'

লাইন থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশের ফাঁকা একটা জায়গায় চলে এল মার্সিডিজ। সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক ওদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছিল। চেহারাই বলে দিল, কর্সিকান। একজন পাকানো রশি, আরেকজন পেটা লোহা। দু'জনেই রক্তচক্ষু মেলে দেখছে রানাকে।

'ব্যাপারটা কী, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ও।

উত্তর না দিয়ে দু'জনের একজন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ঘোষণা দেয়ার মত সঙ্গে কিছু আছে?' পাকানো রশি একটা হাত তুলে ধাক্কা দিল রানার বুকে। জোরে নয়, প্রায় দুর্ঘটনাবশতই বলা যায়; তবে এই এক ধাক্কাতেই বুঝিয়ে দেওয়া হলো এখানে ওর সঙ্গে কী আচরণ করা হবে।

'না, নেই।'

'এই লোক তুরকি,' পেটা লোহা গোঁফে চাড়া দিয়ে বলল, যেন তুরকি হওয়ার বিশেষ একটা কদর্য অর্থ আছে।

'ওর সঙ্গে তুমি কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ?' পাকানো রশি নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা বন্ধু।'

কর্কশ, অশ্লীল দৃষ্টি দিয়ে নাদিয়াকে লেহন করছে দুই কর্সিকান। কাস্টমস শেডের কাছাকাছি পার্ক করা কালো একটা সিডানের দিকে তাকাল রানা। গাড়িটায় সরকারী প্রতীক চিহ্ন সহ নাম্বার প্লেটে প্যারিস শহরের নাম লেখা রয়েছে।

এই দুই কর্সিকান 'অ্যাকশন'-এর সদস্য। আইনের অজুহাত দেখিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে এরা। তবে প্রতিশোধ গ্রহণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে না। নাদিয়ার মত, মার্সিডিজটার উপরও সমান মনোযোগ দেখাচ্ছে তারা।

'হুড আর ট্রাঙ্ক খোলো, তুরকি। হাত চালাও!'

এবারের ধাক্কাটা দু'ফুট পিছিয়ে আসতে বাধ্য করল রানাকে। ওর চেহারা যেমন ভাবলেশহীন ছিল তেমনি থাকল। ও প্রতিরোধ করছে না। এখন একটু নড়লেই গুলি করে ফেলে দেওয়া হবে, আইন রক্ষাকারী একজন অফিসারকে আক্রমণ করবার অজুহাতে।

ইঞ্জিন আর ট্রাঙ্ক খুলে দিল রানা। তবে তাদের সার্চ ওখানেই থেমে থাকল না।

দুই সরকারী সন্ত্রাসী অসংখ্য টিউবের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল, ঝাপটা দিয়ে হাব ক্যাপ খুলল, যেখানে যত ম্যাটিং আছে সব তুলল, তারপরও যখন কিছু পেল না তখন মার্সিডিজকে একটা লিফটে তুলে দিয়ে মাফলার ডিযএনগেজ করল।

'যদি চাই, গোটা গাড়ি খুলে ফেলতে পারি আমরা, বুঝলে, তুরকি। তারচেয়ে বলে ফেলো কোথায় রেখেছ ও-সব।'

'ও-সব মানে কী সব?'

'চালাকি হচ্ছে, না?' পেটা লোহা একটা টায়ার জ্যাক তুলে নিয়ে হালকাভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাল। 'না কি তুমি চাইছ আমরা অন্য পদ্ধতিতে প্রশ্ন করি?'

‘এই যে, আপনারা দু’জন তাড়াতাড়ি কাজ সারুন!’ বর্ডার গার্ডদের ক্যাপটেন চেকপয়েন্ট থেকে গলা চড়িয়ে বলল, গাড়ির দীর্ঘ লাইন নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ‘আরও একটা গাড়িকে লাইন থেকে বের করছি আমি।’

লাল একটা সিট্রোঁয় পাঁচ তরুণকে দেখা গেল, ঘাড়ের উপর লম্বা চুল সহ প্রতিটি মাথা নড়বড় করছে। রানা আন্দাজ করল, মরোক্কান গাঁজায় দম দিয়েছে তারা।

‘না, ওখানেই থাকুন আপনি।’ অ্যাকশনের এক সদস্য চেঁচিয়ে বলল।

গার্ডদের ক্যাপটেন রেগে গিয়ে ফণা তুলল। গাঢ় নীল প্যারামিলিটারি ইউনিফর্ম তার চৌকো কাঠামোর সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। নিজেকে নিয়ে গর্বিত একজন মানুষ। তার স্টেশনে অ্যাকশন সদস্যদের নাক গলানো ভালভাবে নেয়নি সে।

‘আমি এখানকার চার্জে। নারকোটিক পেলে গাড়ি অবশ্যই সাইড করাব। তা ছাড়া, ওদেরকে নিয়ে কী করছেন আপনারা?’ রাস্তার পাশে নেমে এল ক্যাপটেন, হাত দুটো কোমরের বেল্টে। ‘মার্সিডিজে কিছু যদি না পেয়ে থাকেন, ওদেরকে যেতে দিন।’

‘ওদেরকে খোঁজা হচ্ছে।’

‘কী জন্যে? যাদের খোঁজা হচ্ছে তাদের নাম, চেহারার বর্ণনা সব আছে আমার কাছে। কই, এই দু’জনকে তা হলে আমি চিনতে পারছি না কেন?’

‘দেখো ক্যাপটেনের বাচ্চা, এমন এক লাথ মারব না, পাছার হাড় খুলে আসবে! যা শালা, ভাগ!’ পেটা লোহা হাতের জ্যাকটা ঘোরাল।

‘আচ্ছা? ভাগব?’ ক্যাপটেনকে দেখে মনে হলো, অভিজাত কোন মানুষ কৌতুক উপভোগ করছে। গার্ড দু’জনকে ইশারা করল সে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে ঘটনাটা চাক্ষুষ করছে তারা।

ইশারা পেয়ে কাঁধ থেকে নিজেদের সাব মেশিনগান নামাল গার্ডরা।

‘তোমরা দ্বীপের লোক, একটু তো অসভ্য হবেই,’ আবার বলল ক্যাপটেন। ‘কিন্তু আমার এখানে বাঁদরামি করলে আমি তোমাদের কান কেটে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব!’

ক্যাপটেনকেও ভয়ানক মনে হলো রানার, তবে তার ব্যক্তিত্ব সত্যি আকর্ষণীয়। কর্সিকানরা দ্বিধায় পড়ে গেল।

‘প্লিজ, ক্যাপটেন,’ নাক গলাল রানা। ‘ব্যাপারটা বিব্রতকর হয়ে উঠছে। এই ঝামেলা আমরা আপনার অফিসে বসে মিটিয়ে ফেলতে পারি না? ওখান থেকে আপনি প্যারিসের সঙ্গে কথা বলে ওদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন।’

‘দারুণ আইডিয়া,’ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো ক্যাপটেন।

‘বাদ দিন।’ জ্যাক ফেলে দিয়ে সঙ্গীর পিঠে চাপড় মারল পেটা লোহা। ‘কী ঘটেছে ভুলে যান।’

‘কিন্তু এই গাড়ি? মার্সিডিজের দিকে আঙুল তাক করল ক্যাপটেন। ‘এটার কী হবে?’

হেসে উঠে নিজেদের সিডানের দিকে এগোল কর্সিকানরা। ধুলো আর ধোঁয়া

উড়িয়ে চলে গেল তারা।

'ফ্রান্সের হয়ে ক্ষমা চাইছি আমি,' কথাটা বলে রানা আর নাদিয়ার উদ্দেশে স্যালুট করল ক্যাপটেন। 'আমি লজ্জিত।'

সন্ত্রস্ত অধস্তনরা তার নির্দেশে জোড়া লাগাল মার্সিডিজ। সিত্রোঁ আর পাঁচ তরুণের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। ক্যাপটেন নিজের দায়িত্বের পরিধি একটু বাড়িয়ে নিয়ে নাদিয়ার সুবিধে-অসুবিধের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। আর রানা? অম্লান বদনে নাদিয়ার পাওয়া খাতির-যত্নে ভাগ বসাচ্ছে ও।

চেকপয়েন্টের সামনে কোথাও ওদের জন্য অপেক্ষা করছে কর্সিকানরা। ছোট শহর আইরানে দুই লেন বিশিষ্ট একটা রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে ভাঙাচোরা কয়েকটা ট্যুরিস্ট হোটেল, তারপর ঝোপ-ঝাড় আর পাহাড় ছাড়া কিছু নেই। অন্য কোন পথও নেই যে ঘুরে যাওয়া যাবে।

আইরান একটা ফাঁদ।

ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে স্পেনে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু ক্যাপটেন এত বোকা নয় যে তার মনে সন্দেহ জাগবে না।

'আপনাদের গাড়ি একদম নতুনের মত হয়ে গেছে,' রানার সামনে সবিনয়ে মাথা নত করল ক্যাপটেন। তারপর কণ্ঠস্বর নিচু হলো, 'আশা করি বুঝতে চেষ্টা করবেন যে কর্সিকানরা আসলে ফ্রেঞ্চ নয়। রাখা হয়েছে, কারণ সস্তা আর নোংরা কাজগুলো ওদেরকে দিয়ে করানো যায়।'

ক্যাপটেনের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। গাড়িতে উঠে চেকপয়েন্ট থেকে রওনা হলো মার্সিডিস।

'উপায় নেই,' ক্যাপটেনের উদ্দেশে হাত নাড়া থামিয়ে বলল নাদিয়া। 'কর্সিকান দু'টোকে খুন করতে হবে।'

কর্সিকানদের কালো সিডান মার্সিডিজের ছায়া হয়ে পিছনে লেগে থাকল সীমান্ত শহরের প্রথম কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত। মাথার পিছনে বড় একটা খোঁপা বানিয়েছে নাদিয়া। পিস্তলটা কোলে।

'অস্ত্রটা সরিয়ে রাখতে পারো,' বলল রানা। সাইড মিররে চোখ রাখলে পাকানো রশিটাকে হুইলে দেখতে পাচ্ছে ও।

'আমরা যদি ওদেরকে না মারি, ওরা আমাদেরকে মারবে।'

কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। নাদিয়ার দিকে তাকাল রানা।

পিছু নেওয়া লোক দু'জন রানাকে খুন করবে, নাদিয়াকে নয়। প্রথম কর্সিকান কীভাবে ওদের হোটেল স্যুইটে ঢুকেছিল? কে তাকে ঠিকানা দিয়েছিল? এ-সব প্রশ্নের একটাই জবাব: নাদিয়া। ওই সময়ের ভিতর তার জেনে নেওয়ার কথা ছিল কোথায়, কী অবস্থায় আছে আফিমের চালান। আমন্ড বাগান থেকে হোটেলে ফিরবার পথে সেজন্যই আপসেট হয়ে পড়েছিল নাদিয়া, কারণ সে জানত কর্সিকান লোকটা স্যুইটের বাথরুমে অপেক্ষা করছে রানাকে খুন করবার জন্য।

ডি' মোনার সঙ্গে রানার শর্ত ছিল, তার 'প্রতিনিধি'-র তরফ থেকে কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে তার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। নাদিয়ার পার্টনার হিসাবে কর্সিকানের আবির্ভাব ঘটলে সব ভেস্তে যেত, তাই উপস্থিত বুদ্ধি

খাটিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেয় নাদিয়া। পার্টনারের পিঠ ফুটো করে দেয়।

এখন আরও দু'জনকে মেরে ফেলতে চাইছে, তারা ভুল-ভাল কিছু করে তাকে যাতে ফাঁসিয়ে দিতে না পারে।

অবশ্য রানারও ওদের দু'জনকে অন্তত জখম করা দরকার, কারণ অ্যাকশন-এর এজেন্ট পিছনে লেগে থাকলে ওর এই অ্যাসাইনমেন্ট ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তাই নাদিয়া আর রানা, দুই ডারলিং, পেশাগত একটা ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিল।

উল্টোদিক থেকে আসা একটা ট্যাঙ্কার ট্রাক পাসিং লেন থেকে কর্সিকানদের সরে যেতে বাধ্য করল। সেটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্সিডিজের পাশে আসতে চেষ্টা করল তারা, কিন্তু উল্টোদিক থেকে আরেকটা ট্রাক আসছে দেখে আবার সিডানের স্পিড কমাল।

মার্সিডিজের স্পিড নব্বুইয়ে তুলল রানা, প্রয়োজনে একশো চল্লিশে তুলতে পারবে। তবে কর্সিকানদের দৃষ্টিসীমার ভিতরই থাকতে চাইছে ও।

পাহাড়ী পাইন আর ওক গাছগুলো দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে। পিরেনিয কাঠ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এই পাহাড়ে হরিণ, ভালুক আর নেকড়ে আছে। ইচ্ছে করলে টোপ ফেলে কর্সিকানদের একটা লগিং ট্রেইলে নিয়ে যেতে পারে রানা, কিন্তু তার সর্বশেষ ফলাফলটা দেখাবে অনেকটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মত। রানা চায় একটা নির্ভেজাল দুর্ঘটনা।

বোতাম টিপে নিজের দিকের জানালা নামিয়ে দিল ও, নাদিয়াকেও নামাতে বলল।

'তুমি চাও আমি ওদের টায়ারে গুলি করি?'

'যখন যেমন বলব তখন তেমন করবে, নাদিয়া। আমরা একটা ফাঁদ পাতছি।'

বাঁ লেনে চলে এসে পরবর্তী বাঁকে স্পিড কমিয়ে পঁয়ষট্টিতে নামাল রানা। আইরান এখন বহু নীচের উপত্যকায়। রাস্তার কিনারা থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে রয়েছে মার্সিডিজ, কিনারার পর এক হাজার ফুট গভীর খাদ।

একটা ট্রাক হর্ন দিল। বাঁ লেন থেকে দ্রুত ডান লেনে চলে এল রানা। প্রতিবাদে সরব হলো টায়ার, শক্ত হলো নাদিয়ার চোয়াল।

অন্য কোন মেয়ে হলে আতঙ্কে ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরত।

কর্সিকানদের কালো সিডান আবার ওদের পিছনে সেঁটে এল। হুইল ঘুরিয়ে বাম লেনে ফিরে এল রানা।

'সিত্রোঁ ডান পাশে চলে আসতে চাইবে, রানা।'

'সেটাই আমরা চাইছি। তৈরি থাকো, কী করতে হবে জানো তুমি।'

সামনে একের পর এক S আকৃতির বাঁক পড়ল। পাহাড়ী চড়াই ধরে ডান-বাঁয়ে বাঁক ঘুরবার সময় ওদের গাড়ি দুটোর টায়ার আহত পশুর মত করুণ সুরে ককাচ্ছে।

শুধু একটা কারণে ওদের চাকায় এখনও গুলি করছে না কর্সিকানরা:

তারা এখনও বিশ্বাস করে আফিম আনা হয়েছে মার্সিডিজে করেই। রোড অ্যাক্সিডেন্ট পুলিশ ডেকে আনবে। বিধ্বস্ত মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে আসা আফিম

তাদের চোখে ধরা পড়তে বাধ্য।

রানার পিছনের বাম চাকা রাস্তার কিনারাকে এড়িয়ে থাকছে। কিনারার নুড়ি পাথরগুলো শূন্যে লাফ দিয়ে খাদের নীচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তার ধারে অনেকগুলো সাদা ক্রস রয়েছে। অনেকটা সম্মোহিত হয়ে সেগুলোকে দেখছে নাদিয়া। দুর্ঘটনায় যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানেই পোঁতা হয়েছে সাদা ক্রস।

ভারী একটা ট্রাক পড়ল ওদের সামনে, ফার্স্ট গিয়ারে রয়েছে ড্রাইভার। তাকে পাশ কাটাতে যাবে রানা, দ্বিতীয় একটা ট্রাককে তুমুল ঝড়ের মত নেমে আসতে দেখা গেল পাহাড় থেকে।

ঘণ্টায় আশি মাইল থেকে দশ মাইলে নামল মার্সিডিজের স্পিড। বাতাসের প্রবল ঝাপটায় দুলিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ট্রাকটা ওদেরকে পাশ কাটাতেই স্পিড আবার বাড়িয়ে দিল রানা, ধীরগতি প্রথম ট্রাকটাকে পিছনে ফেলল। মার্সিডিজের সঙ্গে চুম্বকের মত সেঁটে আছে কালো সিডান।

পাহাড়ের চূড়ার কাছে চলে এসেছে ওরা, সামনের আর পিছনের দৃশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। পাইনের গন্ধ নিয়ে বাতাস বেশ ধারাল। বাম লেনেই থাকছে রানা, ডান দিক থেকে পাশে চলে এল সিডান।

কর্সিকান ড্রাইভার তার জানালার কাঁচ নামিয়ে ফেলেছে। এ সেই পেটা লোহা। নীচের মাড়িতে সোনার একটা দাঁত, এবারই প্রথম চোখে পড়ল রানার। মার্সিডিজকে আরও কাছে সরাল ও, স্পিড ঘণ্টায় ষাট মাইল। এক সময় মনে হলো গাড়ি দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খাবে। বাঁ হাতে ধরা একটা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ নাদিয়ার জানালা দিয়ে ভিতরে ঢোকাল ড্রাইভার।

গুলির সম্ভাব্য পথ থেকে ঝট করে মাথাটা নিচু করে নিল নাদিয়া। ওটাই স্বাভাবিক, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। রানা চাইছিলও তাই। ড্রাইভার উল্লসিত, মাত্র চার ফুট দূর থেকে ওর মাথায় অটোমেটিক তাক করল। 'স্পিড কমাও, তুরকি।'

মাজলটা কপালের পাশে তাক করা। রানা যেমন চালাচ্ছিল তেমনি চালাচ্ছে। কর্সিকানরা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে চায় না—অন্তত এখনই। পেটা লোহা চট করে সামনেটা একবার দেখে নিল, এক হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে। ঝট্ করে ফিরল মাথাটা, অস্ত্র ধরা হাতের কবজিতে কিসের যেন চাপ!

বোতাম টিপে নিজের জানালার কাঁচ তুলে দিয়েছে নাদিয়া। বোতামের উপর চাপটা ঢিল হতে দিচ্ছে না সে, ফলে ভিতরে আটকা পড়ে গেল ড্রাইভারের হাত। ওদিকে মার্সিডিজকে ধীরে ধীরে রাস্তার ডানদিকে সরিয়ে নিচ্ছে রানা, খাড়া খাদের দিকে। কোন দিকে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে অকস্মাৎ চিৎকার দিল ড্রাইভার।

ঝট্ করে মাথা নামাল রানা। পিস্তলটা গর্জে উঠল দু'বার। বুলেট দুটো ওর মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল, বেরুল ওর দিকের খোলা জানালা গলে।

মরিয়া হয়ে আন্দাজে গুলি করেছে ড্রাইভার। হাত মুক্ত করবার জন্য অস্ত্রটা নাদিয়ার কোলে ফেলে দিল সে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। কবজি পর্যন্ত মার্সিডিজের ভিতর রয়ে গেল তার হাত।

দ্বিতীয় কর্সিকান, পাকানো রশি, প্যাসেঞ্জার সিট থেকে গুলি করতে চাইছে,

কিন্তু ড্রাইভার আড়াল করে রেখেছে টার্গেটকে। ধীরে ধীরে ডান দিকে আরও সরে যাচ্ছে শক্তিশালী মার্সিডিজ। সিডানের জন্য অবশিষ্ট জায়গা ক্রমশ কমে আসছে–দশ থেকে ছয় ফুটে, ছয় থেকে পাঁচ ফুটে।

জানালার বোতাম ছেড়ে দিল নাদিয়া।

প্রথম অদৃশ্য হলো হাতটা, তারপর কর্সিকানরা। যেখানে সিডান ছিল সেখানে এখন শোঁ-শোঁ করছে খোলা বাতাস। কয়েক মুহূর্ত পর ভারী কিছুর পতনের আওয়াজ ভেসে এল পাহাড়ী ঢাল থেকে।

রুমাল দিয়ে ধরে পিস্তলটা তুলল নাদিয়া, তারপর ছুঁড়ে দিল খাদের দিকে। হেলান দিল সিটে, রানার দিকে ফিরে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'তোমার সত্যি তুলনা হয় না, আরসালান। সবদিক থেকে। সেজন্যেই প্রশ্নটা উঠছে: এতদিন আমরা তোমার কথা শুনিনি কেন?'

'তুমি আমার চেয়ে কোন্ অংশে কম শুনি, নাদিয়া? আমিও তো তোমার কথা শুনিনি।'

কথাটা বিবেচনা করে দেখছে নাদিয়া। রানার ইঙ্গিত পরিষ্কার। নাদিয়া পথ না দেখালে কর্সিকানরা কোনভাবেই ওদের পিছু নিতে পারত না।

পিছু নেওয়ার ঘটনাটা সময়ের আগে ঘটতে শুরু করে। ভুলটা যারই হোক, সেটা মারাত্মক হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। খুন না করে সেই ভুল সংশোধন করবার আর কোন উপায় নাদিয়ার সামনে খোলা ছিল না।

তিনদিনে তিনটে খুন। নাদিয়া যেন এক-এক করে পাপড়ি ছিঁড়ছে কোনও বিষাক্ত ফুলের। পরবর্তী পাপড়িটা রানাও হতে পারে।

আট

উত্তর-পুবে বিস্তৃত হাইওয়ে ধরে ফ্রান্স পাড়ি দিচ্ছে ওরা। মাঝে মধ্যে হাইওয়ে ছেড়ে অন্য রাস্তাও ধরছে রানা, তবে দু-এক ঘণ্টা পর আবার ফিরে আসছে হাইওয়েতে।

ওকে এরকম করতে দেখে দুটো সন্দেহ জাগল নাদিয়ার মনে। 'এই, তুমি কি ভয় পাচ্ছ কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে?'

'না।'

'তা হলে যে বারবার রাস্তা বদলাচ্ছ?'

'ইচ্ছে করলে আমাকে তুমি প্রকৃতি-প্রেমিক বলতে পারো,' হাসল রানা। 'নতুন নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারছি না।'

দ্বিতীয় সন্দেহের কারণটা নাদিয়া উচ্চারণ করল না। রানা আসলে একটা ট্রেন লাইন অনুসরণ করছে। ফাঁকা লাইন নয়, তাতে একটা মালগাড়ি আছে।

নাদিয়া জানে এই ট্রেনটা পর্তুগালের আলবুফেইরা থেকে রওনা হয়েছে। রানার লিজ নেওয়া একটা ফ্রেইট কার আছে এই ট্রেনের সঙ্গে। সেই কারে তোলা

হয়েছে আমন্ড পাউডার।

ওই কার সীমান্তে চেক করা হয়েছে। আমন্ড পাউডার ভরা ব্যাগগুলোয় কাস্টমস অফিসাররা কোন আফিম পায়নি। থাকলে তো পাবে।

আফিম যদি না-ই থাকে, ট্রেনটাকে রানার চোখে চোখে রাখবার কী দরকার? ভেবে কোন কূল খুঁজে পাচ্ছে না নাদিয়া।

নাকি আছে আফিম? হয়তো ফ্রান্সের কোন স্টেশনে থেমেছিল ট্রেন, তখন তোলা হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লম্বা করে শ্বাস ফেলল নাদিয়া।

'আচ্ছা, একটা কথার জবাব তো তুমি দিতে পার, তোমার গোপন কিছু ফাঁস না করেই।'

'কী কথা শুনি?' মধুর হাসি রানার ঠোঁটে।

'সত্যিই কি তুমি হেরোইন ডেলিভারি দেবে আমেরিকায়, না কি আলবার্ট ডি মোনার দশ লাখ ডলার মেরে দিয়ে কেটে পড়বে?'

'আমার জবাব তুমি বিশ্বাস করবে কেন?'

'যদি বলি করব?'

'তাহলে মাথাটা একটু খাটাবার পরামর্শ দেব আমি। কেটে পড়বার ইচ্ছে থাকলে একের পর এক তোমাদের আক্রমণ ডিঙিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি কেন?'

রাতে একটা মোটেলে থেমে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক ঘুমাল ওরা। তবে শোবার দু'ঘণ্টা পর নাদিয়া বিছানা ছেড়ে নামবার সময় জেগে উঠল রানা।

কাপড়চোপড় পরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নাদিয়া। ফিরল আধ ঘণ্টা পর। রানা বুঝল, কাউকে ফোন করতে গিয়েছিল। কেন, তা-ও আন্দাজ করতে পারল।

পরবর্তী যাত্রা বিরতি পাহাড়-চূড়ার একটা হোটেলে। জানালা দিয়ে নীচে তাকালে মাইল তিনেক দূরে, উপত্যকার শেষ মাথায় দেখতে পাওয়া যায় ট্রেন লাইনটা।

ট্রেনটায় আফিম আছে, এই বিশ্বাস ক্রমশ আরও দৃঢ় হচ্ছে নাদিয়ার। রানা যে শুধু যতক্ষণ পারা যায় ট্রেন লাইনের কাছাকাছি থাকতে চাইছে, তা নয়; ট্রেনটাকে দেখতে পেলে এমনভাবে তাকিয়ে থাকছে, ওটা যেন সম্মোহিত করেছে ওকে।

নাদিয়া আবার সুযোগ তৈরি করে নিয়ে টেলিফোন করল নিজের লোকদের।

এবারও টের পেল রানা। মনে মনে খুশি ও। নাদিয়া বাহিনীর শক্তি যাই হোক, ও চায় একটা সময় পর্যন্ত ট্রেনটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক তারা। লাইন আর ট্রেনটাকে চোখে চোখে রেখে নাদিয়ার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করবার পিছনে এটাই ওর উদ্দেশ্য।

পরদিন বেলা এগারোটায় আবার সীমান্ত চেকিং। ফ্রান্স থেকে বেরুচ্ছে ওরা। ঢুকছে জার্মানিতে।

সীমান্ত ঘেঁষা জার্মান শহর সারব্রুসকেন-এ রয়েছে বিশাল রেলওয়ে ইয়ার্ড। পশ্চিম থেকে আসা আন্তঃইউরোপীয় সমস্ত ট্রেন এখানেই থামে। এরপর

প্যাসেঞ্জার বা মাল-পত্র জার্মানির নিজস্ব ট্রেন সার্ভিস বহন করে। তবে শুধু লিজ নেয়া কার বাদে।

রেল ইয়ার্ডকে পাশ কাটিয়ে বন-এর দিকে ছুটল ওদের মার্সিডিজ। রানার ফ্রেইট কার এই মুহূর্তে ঠিক কোথায়, নাদিয়ার কোন ধারণা নেই। কারণ সারব্রুকেন শহরে ঢোকেনি রানা, বনের দিকে রওনা হয়েছে একটা বাইপাস রোড ধরে।

শহরে পৌঁছে একটা মোটেলে উঠল ওরা। নাদিয়াকে আবার অত্যন্ত নার্ভাস লাগছে। কারণটা রানা আন্দাজ করতে পারল।

মাফিয়ার প্রভাব আর শক্তির কেন্দ্রবিন্দুগুলো আমেরিকা আর ভূমধ্যসাগর ঘেঁষা ইউরোপেই বেশি। বিন্দুগুলো থেকে দূরত্ব যত বাড়বে, প্রভাবও তত কমবে। মিউনিক, জার্মানির দক্ষিণ ভাগ, মাফিয়া শক্তির সর্বশেষ আউটপোস্ট। কোলন, জার্মানির মাঝখানটা, মিউনিক প্রভাবের দ্বারা সামান্যই দূষিত। বন, কোলনের উত্তরে, একদমই নাগালের বাইরে।

ওরা এখন নো ম্যান'স ল্যান্ডে রয়েছে।

নাদিয়ার হাতে আর কোন বিকল্প নেই। পছন্দ করুক বা না করুক, তাকে এখন রানার দলেই থাকতে হবে।

মোটেল রুমে বসে আয়নায় চোখ রেখে নাদিয়াকেই দেখছে রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে নীলচে ধোঁয়া ছাড়ছে সিলিঙের দিকে।

তারপর ঘুরল সে, রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'ঠিক আছে, আমি হার মানলাম।'

'মানে?'

'এটা তোমার শো। আমি স্রেফ একজন দর্শক। তাই বলছি··· দেখাও কী দেখাবে।'

'ধন্যবাদ।' হাসিটা চেপে রাখল রানা।

সন্ধ্যায় সাপার খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরুল ওরা, গন্তব্য বন ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট। পশ্চিম জার্মানির রাজধানী ছিল বন, ফলে বিদেশী দূতাবাসগুলো সব এখানেই তৈরি করা হয়। দুই জার্মানি এক হওয়ার পর রাজধানী এখন বার্লিন, তবে পুরানো অনেক দূতাবাসই রয়ে গেছে বনে।

আজ সন্ধ্যায় বন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ভবনটা খালি খালি লাগল।

'এখানে কী কারণে এসেছি আমরা?' জানতে চাইল নাদিয়া।

মার্সিডিজ দাঁড় করাল রানা। হাত তুলে দূরের একটা হ্যাঙ্গার দেখাল। 'ওই ওটার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকব আমি।'

'কেন···কী আছে ওখানে?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বিশ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ঈজিপশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা ফ্লাইট, তাতে মিশরের ডিপ্লোম্যাটিক পাউচ থাকবে। আমি ওই পাউচগুলো সংগ্রহ করব।'

নাদিয়া কিছু বলছে না, কারণ জানে রানার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'ওই গেট দিয়ে একটা কালো ক্যাডিলাক বেরিয়ে আসবে, তাতে ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট থাকবে। গাড়িটায় আমি থাকব। তুমি ওটাকে খানিকটা দূর থেকে অনুসরণ করবে। আমি থামব, তবে তুমি ক্যাডিলাককে পাশ কাটিয়ে খানিকটা সামনে চলে যাবে, তারপর থামবে। আমি ক্যাডিলাককে বিদায় করে দিয়ে হেঁটে এসে মার্সিডিজে উঠব। ঠিক আছে?'

কথা না বলে নাদিয়া শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'আইডেনটিফিকেশন?' জার্মান উচ্চারণে জানতে চাইল সবুজ ইউনিফর্ম পরা গার্ড।

নিজের ছবি সহ একটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট বাড়িয়ে ধরল রানা, তাতে ওর পরিচয় দেওয়া হয়েছে–পলিটিক্যাল অফিসার আহমেদ কামাল।

'আপনি এখানে এই প্রথম আসছেন?' ভুরু কুঁচকে ফটোটা পরীক্ষা করছে গার্ড।

'কেন, নতুন কেন হব,' একটু তিরস্কারের সুরেই বলল রানা।

গার্ডের লাল চেহারা আরও একটু গাঢ় হলো। অনুমোদিত ক্যারিয়ার-এর তালিকায় নামটা খুঁজছে সে।

'তাড়াতাড়ি করো, হে!' তাগাদা দিল রানা।

'এখানে আপনার নাম নেই।'

তালিকায় নামটা রাখবার জন্য টাকা দিয়েছে বিসিআই। এত কাঠখড় পুড়িয়ে তৈরি করা প্ল্যানটা যখন সফল হতে চলেছে, এই সময় ছোট্ট একটা ভুল সব ভণ্ডুল করে দেবে? 'কই, দেখি!' বলে গার্ডের হাত থেকে তালিকাটা ছিনিয়ে নিল রানা। নামগুলোর উপর দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে। 'ওরে গর্দভ! তোমরা তো নামের বানান ভুল করেছ, ফলে কামাল হয়ে গেছে ক্যামেল। এই দেখো!'

যতই ঝাঁঝ দেখাক, রানার ভুরুতে ঘামের ফোঁটা জমে গেছে। মেজাজ নিয়ে চড়াও হওয়ায় গার্ড ব্যাপারটা লক্ষ করছে না। গেটটা খুলে দিল সে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরেকটু হলে সাবমেশিন গানটা ফেলে দিচ্ছিল। সে খেয়ালই করল না যে রানা দূতাবাসের গাড়ি নিয়ে আসেনি।

মিশরীয় দূতাবাসের ক্যাডিলাক খানিক দূরে, একটা ফায়ার ট্রাকের পাশে পার্ক করা রয়েছে। গাড়িটায় কোন আরোহী বা ড্রাইভার নেই।

বনে ঈজিপশিয়ান এয়ারলাইন্সের ল্যান্ড করা প্লেন সার্ভিস করে লুফথানসা-র পার্সোনেলরা। দূতাবাস থেকে লিমাজিনটা যে লোক এয়ারপোর্টে নিয়ে এসেছে, এই মুহূর্তে কাছাকাছি একটা পার্কে শেষ কিস্তির টাকা পাওয়ার অপেক্ষায় বসে আছে সে।

ঈজিপশিয়ান এয়ারলাইন্সের সেভেন-জিরো-সেভেন যথাসময়ে ল্যান্ড করল। ইঞ্জিনের গর্জনে কিছুক্ষণ কান পাতা দায় হয়ে উঠল। কুরিয়াররা সচরাচর যা করে থাকে রানাও তাই করছে, প্লেন থামবার আগেই বেরিয়ে এসেছে রানওয়েতে।

জায়গামত থামল জেট। মোবাইল র‍্যাম্প লাগানো হলো দরজায়। মাত্র অল্প কয়েকজন আরোহীকে নামতে দেখল রানা, ঘুম-ঘুম চোখে ক্ষীণ কৌতূহল, টারমাকে অপেক্ষারত ঝকঝকে ক্যাডিলাকটাকে দেখছে। তারা চলে যেতে

লিমাজিন থেকে বেরিয়ে এল রানা, তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল প্লেনের ভিতর।

'ফয়সল কোথায়?' রানা নিজের পরিচয় দিতেই জানতে চাইল স্টুয়ার্ড।

'ইংলিশ ফ্লু।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ,' অভিযোগ করল স্টুয়ার্ড। 'ফয়সলকে আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। শালা নিশ্চয়ই কোন জার্মান মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছে। সত্যি কি না বলো?'

'তবে আর কেউ যেন না জানে!'

অনুমান সত্যি হওয়ায় খিক-খিক করে হাসল মিশরীয় স্টুয়ার্ড, 'ওই শালা কবে যে কী বিপদে জড়িয়ে পড়ে!' মাথা নাড়তে নাড়তে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টে গিয়ে ঢুকল সে। বেরিয়ে এল একটু পরই, দুটো ক্যানভাস ব্যাগ টেনে আনছে।

এখন লোকটা হাসছে না। বরং হাঁপাতে দেখা গেল তাকে। 'কী আছে তোমার এই ব্যাগগুলোয়?' র‍্যাম্পের গায়ে লেগে একটা ব্যাগ ডেবে গেল।

'আল্লাই মালুম,' বলে সই করে ব্যাগ দুটো বুঝে নিল রানা। ক্যানভাসের তৈরি হলেও, দুটো ব্যাগই ইস্পাতের জাল দিয়ে মোড়া। মাথার দিকে মুখগুলো বন্ধ করা হয়েছে কম্বিনেশন লক দিয়ে, তলায় চাকা লাগানো। ব্যাগ দুটোর গায়ে স্টেনসিল স্ট্রাইপ রয়েছে, তাতে মিশরের জাতীয় পতাকা দেখা যাচ্ছে।

দুটো ব্যাগের ওজন দু'রকম—একটা প্রায় ত্রিশ পাউন্ড, আরেকটা আড়াইশো পাউন্ড। চাকা থাকায় র‍্যাম্প ধরে নামাতে কোন সমস্যা হলো না।

ক্যাডিলাকের কাছে ফিরে এসে রানা উপলব্ধি করল, স্টুয়ার্ড আসলেও খুব ভালভাবেই চেনে ফয়সলকে। একজন নয়, তিন-তিনটে মিশরীয় এয়ার হোস্টেস গাড়ির ব্যাকসিটে বসে মহানন্দে কিচিরমিচির করছে। প্রশ্ন করতে জানা গেল, ফয়সলের বান্ধবী তারা, সে তাদেরকে প্রায় প্রতিবারই বনে পৌঁছে দেয়। চোখ গরম করে তিনজনকেই ভাগিয়ে দিল রানা।

শহরে ফিরবার পথে অর্ধেক দূরত্ব পার হওয়ার পর মেইন রোড ছেড়ে একটা পার্কে ঢুকল রানা। পার্কের ভিতর বাচ্চাদের খেলাধুলোর জন্য মাঠ আছে, সেই মাঠের কিনারায় ফেলা কাঠের বেঞ্চে বসে সিগারেট ফুঁকছে ফয়সল।

ক্যাডিলাক দেখে বেঞ্চ ছেড়ে এগিয়ে এল সে। মাঝ পথে একবার থেমে সিগারেট ফেলে পা দিয়ে মাড়াল—এটা সংকেত, নিজেকে দূতাবাসের ফয়সল বলে দাবি করছে। 'সব ঠিক আছে তো, সার?' রানা দরজা খুলে দিতে জানতে চাইল।

গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল সে।

'হ্যাঁ।' লোকটার হাতে মোটা একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল রানা।

সেটা ছিঁড়ে জার্মান মার্কগুলো নার্ভাস ভঙ্গিতে গুণল ফয়সল। দুর্নীতি করে লাভবান হওয়ার পর তার বোধহয় দেশপ্রেম উথলে উঠল—ব্যাগের লক দুটো চেক করল সে।

'বুঝলেন, সার, একটা সত্যি কথা বলি। এটা যদি আমার দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কিছু হত, কেউ আমাকে এ কাজে রাজি করাতে পারত না।'

'জানা কথা। ব্যাগ খোলো, ফয়সল। আমি তাকাব না।'

ডায়াল ক্লিক করবার আওয়াজ শুনছে রানা। এই আওয়াজ শুনেই ফয়সলকে কম্বিনেশন নম্বর বলে দিতে পারে ও। তবে শুধু শুধু একজন লোককে ভয় দেখাবার দরকার কী।

'বড্ড ভারী দেখছি!' গুঙিয়ে উঠল ফয়সল।

'ঠিক আছে, ছাড়ো, আমি বের করি,' বলে বড় ক্যানভাস ব্যাগের ভিতর থেকে দুশো বিশ পাউন্ড ওজনের একটা প্লাস্টিক ব্যাগ টেনে-হিঁচড়ে বের করল রানা, ভিতরে রয়েছে বাদামী পাউডার। প্রসেসিঙের পর এরই মূল্য দাঁড়াবে একশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

'এ তো আফিম!' প্রায় হাঁপাতে শুরু করল ফয়সল।

'কী ভেবেছিলে, আলহামরা লাইব্রেরির বই স্মাগলিং করব?'

'এ স্রেফ ডাকাতি!' এনভেলাপটা রানার দিকে তাক করে ঝাঁকাচ্ছে ফয়সল। 'আমার আরও অনেক বেশি টাকা পাওনা হয়।'

'তুমি যদি মুখ বন্ধ রাখো, পরবর্তী শিপমেন্টে অনেক বেশি টাকা পাবে। আরেকটা কথা ভুলে যেয়ো না, ওপর মহল থেকে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমার সঙ্গে যেন সহযোগিতা করা হয়। তুমি যদি অসহযোগিতা করো, কেউ হয়তো তোমাকে এমন ফাঁসান ফাঁসাবে যে জীবনে আর সেই ঝামেলা থেকে বেরুতে পারবে না। তুমি কি সেটাই চাইছ?'

ফয়সলের পা এবার বোধহয় মাটিতে পড়ল। মাথা চুলকাল সে। গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার আগে তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা।

আফিম ভর্তি ব্যাগ নিয়ে একশো গজ হাঁটতে হলো রানাকে। রাস্তার ধারে আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্সিডিজ। ব্যাকসিটে ব্যাগটা তুলে দিয়ে নাদিয়ার পাশে উঠে বসল ও।

'এবার?'

'এবার আমাদের রেলওয়ে কার।' ব্যাড গডেসবার্গ কোন পথ ধরে যেতে হবে, নাদিয়াকে বুঝিয়ে দিল রানা। বন-এর দক্ষিণে ওটা একটা ছোট শহর।

পৌঁছাতে মিনিট দশেক লাগল ওদের। শহর না বলে গডেসবার্গকে ছোট একটা গ্রাম বললেই যেন বেশি মানায়। বাড়িঘরগুলো এত সুন্দর, যেন খেলনা। সংখ্যায় ওগুলো খুবই কম, তেমনি কম লোকসংখ্যা। শহরের শেষ মাথায় একটা রেলওয়ে ইয়ার্ড। ঘূর্ণিঝড় ঠেকাবার জন্য একটা বেড়া আছে বটে, তবে সেটা অনেক জায়গাতেই ভাঙা। অনেক দূরে নাইট ওয়াচম্যানের শেডটা দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার, তবে ঘরের ভিতর থেকে অন করা টেলিভিশনের আভা বেরুচ্ছে।

'তুমি ঠিক জানো এখানকার সিকিউরিটি এরকমই, না থাকার মত?' জিগ্যেস করল নাদিয়া।

'এখানে সিকিউরিটির কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? জার্মানির এদিকটায় খাবার জিনিস আর গোবর ছাড়া মূল্যবান কিছুই নেই।'

গাড়ি থামাল নাদিয়া। প্লাস্টিক ব্যাগটা নিয়ে নামল রানা। বেড়ার ফাঁক গলে আইন ভাঙল ওরা, ঢুকে পড়ল রেলওয়ে ইয়ার্ডে।

সব মিলিয়ে পাঁচটা রেললাইন দেখা গেল। তবে আগে থেকেই জানে রানা কোন লাইনটায় থাকবে বন-সারক্রুসকেন ট্রেন। পেনসিল টর্চের ক্ষীণ আলোয় ডাফম্যান ওবারসি বেনিফিটকে লিজ দেওয়া কারটা খুঁজে নিল ও।

দরজায় কম্বিনেশন লক আর প্যাডলক, দু'ধরনের তালাই ব্যবহার করা হয়েছে। 'আমার বিশ্বাস,' আড়চোখে নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'এই তালাগুলো খোলার চেষ্টা করা হয়েছে। খুলতে যদি পারতও, তাতে কোন লাভ হত না, কী বলো?'

কথা না বলে সরু ঠোঁট জোড়া শুধু একটু বাঁকাল নাদিয়া।

কম্বিনেশন নম্বর মুখস্থ করা আছে, লকটা সহজেই খুলতে পারল রানা। তারপর ওর লেসার'স কী দিয়ে ভারী প্যাডলকটাও খুলল। উঁচু দরজা দিয়ে ভিতরে তুলল ব্যাগ আর নাদিয়াকে।

'এই কারটাকেই আমরা তা হলে গোটা ইউরোপের ওপর দিয়ে অনুসরণ করে আসছি।' চোখ বুলিয়ে চারদিক দেখে নিচ্ছে নাদিয়া। কার-এর মেঝেটা দখল করে রেখেছে একশো কিলো করে আমন্ড পাউডার নিয়ে বিশটা ব্যাগ।

'এই কার এরপর কোথায় যাবে?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন করা অন্যায়, নাদিয়া,' বলল রানা, হাসছে। 'তোমার আসলে কিছু জানতে চাওয়াই তো উচিত নয়। কারণ, সব তোমাকে দেখিয়েই করছি আমি।'

'প্রশ্নটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'নিজের চোখেই দেখতে পাবে কোথায় যায় কারটা। তবু এত যখন আগ্রহ দেখাচ্ছ, আগেভাগেই জানিয়ে দিই—ট্রেনটার পরবর্তী গন্তব্য লুবেক।'

'ওখানে কী?'

হাসল রানা। 'ওখানেই তো সব।'

'আচ্ছা?' নাদিয়ার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'কথাটার মানে?'

'আমাকে কাজ করতে দাও,' বলল রানা। 'আর পারলে একটু সাহায্য করো।'

প্রতিটি সীমান্তে ব্যাগগুলো চেক করা হয়েছে, চেক করবার পর ব্যাগের গায়ে রঙ বা কালি দিয়ে বিশেষ চিহ্নও আঁকা হয়েছে। আফিম ভর্তি ব্যাগটা বাকি বিশটা ব্যাগের মতই দেখতে, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি, কিন্তু গায়ে কোন সিল-ছাপ্পড় অর্থাৎ চিহ্ন নেই।

এখানে আসবার পথে কিছু রঙ আর কালি কিনেছে রানা, সেগুলো পকেট থেকে বের করে খুলল ও। অন্যান্য ব্যাগের গায়ে যে-ধরনের চিহ্ন আছে, আফিমের ব্যাগটাতেও হুবহু সেরকম কিছু চিহ্ন আঁকল।

'লুবেক থেকে আমরা ডেনমার্কে যাব, না কি বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য কোথাও?' জানতে চাইল নাদিয়া।

'হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?'

'তোমার কাজ দেখে মনে হচ্ছে আবার কোন সীমান্তে এই ব্যাগগুলো চেক করা হবে।'

'আসলে এই পাউডার আর কোন সীমান্ত পেরুবে না,' বলল রানা। 'লুবেকেই এগুলোর শেষ ঠিকানা।'

'তা হলে যে কাজটা করছ, এটার ব্যাখ্যা কী?'

'লুবেকে এই ব্যাগগুলো ডেলিভারি নেব আমি,' বলল রানা। 'ওখানকার স্টেশনের কর্মচারীরা আমাকে চেকিং করা বিশটা ব্যাগ বুঝিয়ে দেবে। আমার ট্রাকে তুলেও দেবে ওগুলো। তখন যদি ওরা দেখে যে বিশটা নয়, ব্যাগ রয়েছে একুশটা, তা হলে সমস্যা না?'

'বিরাট।'

'তাই একটা আমন্ড পাউডার ভর্তি ব্যাগ কার থেকে সরিয়ে নেব আমরা। তার বদলে এই নতুন ব্যাগটা থাকবে।'

লুবেকের পথে রওনা হয়ে একটা পাহাড়ী লেকের পাশে মার্সিডিজ থামাল রানা। ট্রেন থেকে নামিয়ে আনা ব্যাগটার মুখ খুলে পানির উপর উপুড় করে ধরল। একশো কিলো পাউডার ভিজতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। ভিজবার পর নিঃশেষে মিশে গেল পানির সঙ্গে। প্লাস্টিকের ব্যাগটায় আগুন ধরিয়ে দিল রানা। নির্জন পাহাড়ী এলাকা, কেউ ওদেরকে জিজ্ঞেস করবার নেই কী হচ্ছে এখানে।

তবে ওখান থেকেই রানার লিজ নেওয়া কার সহ ট্রেনটাকে কু-উ-উ করে হুইসেল বাজিয়ে লেকের অপরপ্রান্ত দিয়ে ছুটে যেতে দেখা গেল।

বন্দর নগরী লুবেকে হোটেলের কোন অভাব নেই। এটা একটা ঐতিহাসিক শহরও বটে। ওয়েস্ট জার্মেনির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ড এই লুবেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

নাদিয়াকে নিয়ে একটা ফ্রেঞ্চ হোটেলে উঠল রানা। আসবার পথে কিছু ইকুইপমেন্ট আর কাপড়চোপড় কিনেছে। এক গ্যারেজ থেকে আরও কিনেছে একটা ট্রাক। ওই গ্যারেজেই থাকল সেটা, পরে ডেলিভারি নেবে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে একাই বেরুল রানা। নাদিয়ার বোধহয় কাউকে ফোন করা দরকার, তাই সে রানার সঙ্গে যেতে চাইল না।

রানা ফিরল দু'ঘণ্টা পর। রুম সার্ভিসকে ডেকে হোটেলেই লাঞ্চ সারল ওরা। দুপুরে এক বিছানায় শুয়ে গল্প করল দু'জন।

তবে গল্প জমল না, কারণ কারুরই খেয়াল নেই কে কী বলছে; পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু অনুভব করছে না ওরা।

উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর কেটে গেল বেশ কিছু সময়। তারপর রানা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে একটা গল্প শোনাই।'

একটা চাদর টেনে নিয়ে মিষ্টি করে হাসল নাদিয়া। 'কী গল্প, আরসালান?'

'ভারত,' বলল রানা। 'রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। ডিস্ট্রিক্টের নাম মেদিনীপুর। বছর পাঁচেক আগের কথা। রামনগর থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে, একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় হঠাৎ একদিন আবির্ভাব ঘটল এক সন্ন্যাসীর।'

শুয়েই থাকল নাদিয়া, তবে ধীরে ধীরে রানার দিকে পুরোপুরি কাত হলো সে, মাথাটা উঁচু করে ডান হাতের তালুতে রাখল, কনুই থাকল বিছানায়। চোখে আশ্চর্য

একটা অবাক করা দৃষ্টি।

'কয়েক দিনের মধ্যেই রটে গেল, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি যা উত্তর দেন, তা প্রতিবার নির্ভুল প্রমাণিত হয়। এবং কার ভাগ্যে কী আছে জানতে চাওয়া হলে তিনি যা বলেন তা শতকরা একশো ভাগ ফলে যায়।'

'জানতে পারি, এরকম একটা উদ্ভট গল্প আমাকে কেন শোনাচ্ছ তুমি?' বিছানার উপর সিধে হয়ে বসল নাদিয়া, চাদরটা গলার কাছে মুঠো করে ধরে আছে।

'এই বাবার নাম ছিল রাজীব ত্রিপাঠি। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে অশ্বত্থ গাছটার তলায় প্রচুর লোকজন আসতে লাগল। লোকে তাঁকে ভগবান বলে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনি একদিন হঠাৎ এলাকার মানুষকে হতাশ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।'

'আরসালান,' গম্ভীর সুরে বলল নাদিয়া, 'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না।'

'তবে অনুসন্ধান চালিয়ে কিছু সূত্র পাওয়া গেল,' বলে চলেছে রানা, এবারও নাদিয়ার কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'ওই সময় দীঘায় বেড়াতে এসেছিল আমান্ডা নামে এক আমেরিকান তরুণী। আমান্ডা ভারতে আসে তার বাবা রকহার্ড আলঘেরোর সঙ্গে। রকহার্ড বোম্বেতে থেকে যায়, আমান্ডা তার বান্ধবী শেলিকে নিয়ে চলে আসে দীঘায়।

'দীঘায় থাকতেই ভগবান রাজীব ত্রিপাঠির কথা শুনতে পায় আমান্ডা। ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দু ধর্ম, ঋষি, সন্ন্যাসী ইত্যাদি সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল প্রবল। দীঘা থেকে বান্ধবী শেলিকে নিয়ে রামনগরে চলে আসে সে।

'শোনা যায়, আমান্ডা শুধু নিজে ভগবান রাজীব ত্রিপাঠিকে দেখে মুগ্ধ হয়নি, বাবাও আমান্ডাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। মেয়েটিকে চোখ মেলে দেখা মাত্র তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "তুই হবি দুনিয়ার পুরো একটা গোলার্ধের অঘোষিত সম্রাজ্ঞী। তোর এত টাকা হবে যে তা কেউ কোনদিন গুণে শেষ করতে পারবে না। তবে সেজন্যে তোকে কিছু মাসুলও গুণতে হবে। বিপদ আসবে একের পর এক।"

'আমান্ডা তখন জানতে চায়, "সে-সব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কী কোন উপায় নেই?" জবাবে ভগবান বলেন, "উপায় একটাই, আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দিতে পারব কখন কী বিপদ আসছে। যে বিপদই আসুক, পনেরো দিন আগে টের পাই আমি।" এরপর আমান্ডা পরীক্ষা নিল। ধ্যানমগ্ন ভগবানকে সে তার নিজের এবং বাবার অতীত জিজ্ঞেস করল। গড়গড় করে জবাব দিয়ে গেলেন রাজীব ত্রিপাঠি।'

'এবং সে-সব হুবহু মিলেও গেল!' নাদিয়া প্রশ্ন করল না, যেন সায় দিয়ে কথাটা বলল।

'এরপর মেয়ের টেলিফোন পেয়ে বোম্বে থেকে উড়ে এল হার্ডরক আলঘেরো। সে-ও পরীক্ষা করল ভগবান রাজীব ত্রিপাঠির অলৌকিক ক্ষমতা।

'তারপরের ঘটনা দুঃখজনক। আমান্ডা আর শেলি দীঘা থেকে রামনগরে আসার সময় সঙ্গে করে একজন গাইডকে নিয়ে এসেছিল। সেই গাইডের নাম সদাশয় গুপ্ত।

'গাইড সদাশয় বাবুর বক্তব্য হলো—একদিন ভগবান রাজীব ত্রিপাঠির দর্শন শেষে হোটেলে ফিরছিল তারা। তাদের দলে ছিল রকহার্ড, আমান্ডা, শেলি আর সে নিজে। জঙ্গলের এক জায়গায় হঠাৎ কেউ তার পিঠে ছুরি মারে।'

শিউরে উঠল নাদিয়া।

'সদাশয় বাবুর জ্ঞান ফেরে তিন দিন পর। তখন তিনি জানতে পারেন, আহত অবস্থায় তাকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সেখানেই পড়ে ছিল শেলির লাশ। তবে না, সেই থেকে আমান্ডা আর তার বাবাকে জীবিত বা মৃত কোথাও পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি ভগবান রাজীব ত্রিপাঠিকেও।

'জেলার পুলিশ আর সিআইডি কেসটা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে। বোম্বে পুলিশের সাহায্য নিয়েছে তারা, সাহায্য নিয়েছে মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ এফবিআই-এরও। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তদন্তে বেরিয়ে আসে আমান্ডা আর রকহার্ড আলঘেরোর পাসপোর্টটা ছিল জাল, ফলে ওদের আসল নাম আর পরিচয় কোনদিন জানা যাবে না। তবে শেলির পরিচয় পাওয়া গেছে। সে একজন ফরাসী ছিল, আমান্ডার সঙ্গে পরিচয় হয় বোম্বেতে।

'প্রশ্ন উঠতে পারে, এত কথা আমি জানলাম কীভাবে। জেনেছি সদাশয় গুপ্তর মুখ থেকে। বর্তমানে তিনি রামনগর থানার দারোগা।

'সদাশয় বাবুর ধারণা, তথাকথিত রকহার্ডই খুন করার উদ্দেশে তাকে আর শেলিকে ছুরি মেরেছিল। তাঁর ব্যাখ্যা হলো: রকহার্ড নিশ্চয়ই একজন ক্রিমিনাল। ভগবান রাজীব ত্রিপাঠির অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তার মাথায় শয়তানী বুদ্ধি চাপে। ভগবানকে সে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে কোটি কোটি ডলার কামাবার মতলব আঁটে। বাবা কোথায় যাচ্ছেন, কে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে, এ-সব গোপন রাখতে হবে, তাই সে মেয়ের বান্ধবী আর গাইডকে খুন করতে চেয়েছিল।

'সদাশয় বাবুর আরও ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডে মেয়েটার, অর্থাৎ আমান্ডার কোন ভূমিকা ছিল না। আমান্ডাকে সে যতটুকু দেখেছে, মনে হয়েছে কোন পাপ তাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না।

'এই হলো আমার গল্প।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'এই গল্পের কয়েকটা সুতো আলগা পাবে তুমি, যেমন—মেয়েটা যদি এত ভাল, এতই নিষ্পাপ হবে, বাবার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেনি কেন? যেমন—রামনগরের কাছে, দীঘার সৈকতে, অনন্য রায়হান নামে যে তরুণ গত মাসে খুন হয়েছে, তার জন্যেও কী রকহার্ড বা তার মেয়ে দায়ী?'

নীরবতা দীর্ঘ হতে হতে নিস্তব্ধতায় পরিণত হতে চলেছে, এই সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচু গলায় জানতে চাইল নাদিয়া, 'তুমি কি এই আশায় গল্পটা শোনালে যে আমি আমার গুরু সম্পর্কে সব কথা খুলে বলব তোমাকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কিছু আশা বা প্রত্যাশা করে গল্পটা আমি শোনাইনি।

আমার মন থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত ফেয়ার থাকার তাগাদা অনুভব করেছি, তাই যতটুকু বলা দরকার ততটুকু বললাম। এটাকে তুমি বলতে পারো গত কদিনে আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ।'

'ধন্যবাদ। সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমারও আছে, সেটা আমি আমার সময় মত প্রকাশ করব।'

বিকেলে নাদিয়াকে নিয়ে বেরুল রানা। এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে একটা ফ্রেঞ্চ বার-এ ঢুকল ওরা।

ওয়েটার অর্ডার নিয়ে ফিরে যাচ্ছে. নাদিয়া বলল, 'তোমার হাবভাব দেখে মনে হলো এখানে তুমি আগেও দু'একবার ওয়াইনের অর্ডার দিয়েছ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, তা নয়। আসলে তুমি কী চাও জানা থাকলে নার্ভাস হতে হয় না।'

'তা হলে বলতে হয় সব সময়, প্রতিটি বিষয়ে তুমি জানো তুমি কী চাও। তোমাকে আমার ওয়ান-ম্যান কমপিউটারাইজড় আর্মি বলে মনে হয়েছে। এদিক থেকে, অন্যান্য বিশ্লেষণেও, আলবার্ট ডি' মোনা তোমার ধারেকাছেও নেই। তোমার সঙ্গে বেরুবার আগে এই ব্যাপারটা আমার ধরতে পারা উচিত ছিল।'

'তাতে কী হয়েছে, নাদিয়া। এখন তো জানো।'

'অথচ, এখনও তোমার সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না। তোমার জন্ম ধনীর ঘরে, না গরীবের? তুমি স্মাগলার, মার্সেনারি 'সোলজার, নাকি দুটোই?'

রানা হাসছে।

'তুরস্ক, গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স পেরিয়ে এসেছি আমরা। এখন জার্মানিতে। এ কী করে সম্ভব যে তুমি সব ক'টা ভাষা জানো? তোমার সম্পর্কে ওদেরকে যখন রিপোর্ট করব, শুনে ওরা বলবে—এত ভাল স্রেফ সম্ভব নয়।'

'সেটা কী খারাপ?'

'অস্বাভাবিক, আরসালান।'

'তা হলে ধরে নাও আমি তাই, অস্বাভাবিক।' নাদিয়ার বাকি সব প্রশ্ন এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করছে রানা।

হোটেলে ফিরবার পথে পেট্রিকিরশে ক্যাথেড্রালে থামল ওরা। গাইড জানাল, ঐতিহাসিক লুবেক শহর ভাল করে দেখতে হলে ক্যাথেড্রালের টাওয়ারে উঠতে হবে। সন্ধ্যা হতে এখনও বেশ খানিক দেরি আছে। টাওয়ারের মাথায় উঠে সাগর থেকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ নিল ওরা।

'তুমি কী আমাকে বলবে এই শহরে কেন এসেছি আমরা?' গাইড তার পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যাওয়ার পর জানতে চাইল নাদিয়া।

'চারদিকটা ভাল করে দেখো।'

কিছুক্ষণ পর নাদিয়া বলল, 'চারপাশে প্রচুর মধ্যযুগের ইন্টারেস্টিং আর্কিটেকচার দেখতে পাচ্ছি। আর কী দেখার আছে?'

হাত তুলে শহরের উত্তর দিকটা দেখাল রানা। দিগন্তের কাছে সবুজ সাগর ঝিলমিল করছে। 'ওটা বাল্টিক সাগর। জার্মানির জাহাজ এই সাগর থেকে রওনা

হয়ে নর্থ সী আর আটলান্টিকে চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে নিউ ইয়র্কেও। এবার বলো, লুবেকের লোকজন সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'কিচ্ছু না।'

'অনেকদিন আগের কথা। শত্রুরা একবার লুবেক শহরটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। শত্রু সৈন্যদের উদ্দেশ্য ছিল লুবেকের অধিবাসীরা যাতে খেতে না পেয়ে মারা যায়। কিন্তু আত্মসমর্পণ না করে লোকজন কী করল?

'তারা আমন্ড গুঁড়ো করল। গুঁড়ো, অর্থাৎ পাউডার আমন্ড দিয়ে রুটি বানিয়ে খেল তারা। আমন্ড ব্রেডকে বলা হয় মারজিপ্যান। গোটা দুনিয়ায় লুবেক হলো মারজিপ্যানের রাজধানী।

'লুবেকের প্রতিটি দোকানে, রেস্তোরাঁয়, বারে তুমি এই মারজিপ্যান পাবে। আমরা যে বার থেকে এলাম, ওরাও একটা প্লেটে মারজিপ্যান দিয়েছিল, এই নাও, তোমার জন্য একটা নিয়ে এসেছি।'

রানার হাত থেকে পিস্তল আকৃতির ছোট্ট একটা চকলেট নিল নাদিয়া। উল্টেপাল্টে দেখছে সে।

রানা ভাবল, ওর সেক্রেটারি কাকলি এটা পেলে উল্টেপাল্টে দেখবার ঝামেলায় যেত না, টপ করে মুখে পুরে চুষতে শুরু করত।

চকলেটটা ফেরত দিল নাদিয়া। 'মিষ্টি আমি বেশি পছন্দ করি না, আরসালান। ধন্যবাদ। তবে একটা কথা। এর আগে আমি বুঝিনি তুমি আসলে সচল একটা এনসাইক্লোপিডিয়া।'

'শুধু সচল এনসাইক্লোপিডিয়া নই। একটু ঝুঁকে নীচে তাকাও। ওই যে, ওই বারে আমরা বসেছিলাম–দেখতে পাচ্ছ? ওই রাস্তারই বাম দিকে, প্রায় শেষ মাথায় লাল ইঁটের দালানটা দেখতে পাচ্ছ? ওটা ডাফম্যান ওবারসি বেনিফিট। ওটাও আমার একটা পরিচয়। আমিও মারজিপ্যান এক্সপোর্ট করি।'

ভুরু কুঁচকে বড়সড় দালানটার দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিয়া। তারপর বলল, 'বুঝলাম, তোমার কোম্পানির এই ছোট্ট শাখাটা আসলে আমন্ড পাউডারের শিপমেন্টের জন্যে একটা কাভার। কাভারটা এখানে আফিম আনার কাজে নিখুঁত একটা ক্যামোফ্লাজও বটে। ও-সব ঝামেলা শেষ। এবার বলো, আফিমটা কীভাবে তুমি নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাচ্ছ?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নাদিয়ার অস্বস্তি খানিক বাড়তে দিল রানা, তারপর বলল, 'নাদিয়া, এই মাত্র সেটাই তো বললাম তোমাকে।'

নয়

আফিম থেকে হেরোইন তৈরি জটিল একটা পদ্ধতি, ল্যাবরেটরি ছাড়া কাজটা সম্ভব নয়। লাল দালানের ভিতর, ডাফম্যান বেনিফিটের মালিকানা সূত্রে, একটা ক্যান্ডি ফ্যাক্টরি পেয়েছে রানা; সেই ফ্যাক্টরিতে, স্বভাবতই, একটা ল্যাবও আছে।

সময়টা সন্ধ্যা। নিয়মিত কর্মচারীরা ডিউটি শেষ করে যে-যার বাড়ি ফিরে গেছে।

পরনে ওভারঅল, লুবেক রেল টার্মিনাল থেকে চালিয়ে আনা ট্রাকটাকে পিছু হটিয়ে ফ্যাক্টরির দরজায় থামাল রানা।

ট্রাকের ক্যাব থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামছে ও, ওদিকে নাদিয়াকে দেখা গেল ফ্যাক্টরির দরজা খুলছে।

'কোন অসুবিধে হয়নি তো, আরসালান?'

রেলওয়ের ইনভয়েসটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা, তাতে লেখা আছে–বিশটা আমন্ড পাউডারের ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

ব্যাগগুলো কারখানার ভিতর ঢুকাবার পর দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল রানা। তারপর হাত দিল একশো মিলিয়ন দামের ব্যাগটায়। ওটাকে টেনে ক্যান্ডি ভ্যাটগুলোর কাছে নিয়ে এল।

'ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়।' নাদিয়াও ওভারঅল পরেছে। তার পিঁয়াজ রঙের চুল স্তূপ হয়ে আছে সবুজ উলের একটা ক্যাপের ভিতর। 'আমি কখনও প্রসেস করিনি, তবে জানি যে জিনিসটা সাদা পাউডারের মতই দেখতে হয়। তা সেই পাউডার তুমি লুকাবে কীভাবে?'

'তোমার চোখের সামনেই সব ঘটবে, নাদিয়া।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'শ্রমিকরা ফিরে আসার আগে আমাদের হাতে সময় আছে চোদ্দ ঘণ্টা। কাজেই সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না। এসো, কাজ শুরু করি।'

'বেশ।'

নাদিয়ার হাতে রাবারের একটা গ্যাস মাস্ক ধরিয়ে দিল রানা। 'ওটা ব্যবহার না করলে বাষ্প তোমাকে চাঁদের উল্টোপিঠে পৌঁছে দেবে।'

দু'জনেই মাস্ক পরে নিল। নাদিয়ার পটলচেরা চোখ সন্দেহভরা দৃষ্টিতে অনুসরণ করছে রানাকে।

ব্যাগটার গলা থেকে সিল খুলল রানা, টেনে ব্যান্ডটা ছাড়াল, তারপর ভিতরের সব আফিম ঢালল ভ্যাটে। 'ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে ইনসিনারেটার শুটে ফেলে দাও।'

ইতস্তত করে সেটা ধরল নাদিয়া। 'পোড়া আফিমের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে না?'

'অন্যান্য ব্যাগের সঙ্গে কাল পুড়বে ওটা। প্লাস্টিক ছাড়া অন্য কিছুর গন্ধ পাবে না কেউ।'

ব্যাগটা এবার ইনসিনারেটার শুটে ফেলে দিল নাদিয়া।

ভ্যাটে, আফিমের পর, অ্যাসিটোন ঢালল রানা। 'ভাল করে মিশুক জিনিসটা,' বলে বোতামে চাপ দিয়ে ভ্যাটের মিক্সিং প্যাডেল চালু করল। 'শব্দ নিয়ে চিন্তা কোরো না। এটা কমার্শিয়াল স্ট্রিট। তা ছাড়া, রাস্তায় এখনও প্রচুর গাড়ি, আমাদের শব্দ চাপা পড়ে যাবে।'

'দুশ্চিন্তা করার আর তা হলে কিছু নেই আমাদের?'

'আছে। মারাত্মক কিছু বিপদ আছে। মিকশ্চারটা গরম করতে হবে। যদি

বেশি গরম করে ফেলো, বোমার মত বিস্ফোরিত হবে। এরপর ধরো—কী পরিমাণ বিদ্যুৎ তুমি খরচ করবে, দূষিত পানি নিয়ে কী করবে ইত্যাদি সমস্যা হতে পারত, যদি নিজের বাড়িতে ল্যাবটা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে তুমি।

'কিন্তু একটা ক্যান্ডি ফ্যাক্টরি প্রচুর ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে। আর দূষিত বা ঘোলা পানি নিষ্কাশনের জন্যে আমাদের একটা কমার্শিয়াল স্লুইস আছে, লুবেকের মূল নর্দমায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে।'

'তুমি দেখছি সবই ভেবে রেখেছ।'

ত্রিশ মিনিট পর ভ্যাটের গায়ে বসানো টেমপারেচার ডায়ালগুলো খুলল রানা। সাধারণত এগুলো আমন্ড পাউডার আর চিনি গলাবার সময় ব্যবহার করা হয়, এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে ভিন্ন ধরনের স্বাদ পাওয়ার আশায়। তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সেট করল রানা (২১২ ফারেনহাইট)।

'আফিম আসলে একটা মরফিন বেস-এর বেশি কিছু নয়। বর্জ্য বা ভেজাল যা কিছু আছে ওই অ্যাসিটোনই সব বের করে নেবে।'

ক্যান্ডির ভ্যাটগুলো ভ্যাকিউম পাম্প সহই তৈরি, কারণ যে পদ্ধতিতে আফিম থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস বের করা হয় প্রায় সেই একই পদ্ধতিতে চকলেট আর মিষ্টি তৈরির উপাদানও বর্জ্যমুক্ত করা হয়। নলের সাহায্যে অ্যাসিটোন তুলে ফেলল রানা, ভ্যাটে রয়ে গেল গাঢ় বাদামি রঙের মরফিন বেস—এটাই উন্নত মানসম্পন্ন আফিমের স্বাভাবিক রঙ। পরিশোধিত মাদককে এবার সাদা করে তুলবার জন্য এক ব্যাগ কার্বন ব্ল্যাক ঢালল ও, তারপর আবার ভ্যাটের প্যাডেলগুলো চালু করে দিল।

'আজ আমরা একটা বিশ্ব-রেকর্ড তৈরি করতে যাচ্ছি, নাদিয়া। যে-কোন মার্সেই ল্যাবে একবারে খুব বেশি হলে বিশ পাউন্ড আফিম প্রসেস করা হয়েছে। আমরা তারচেয়ে অনেক বেশি করছি।'

ফ্যাক্টরির চারদিকে চোখ বুলিয়ে অসংখ্য ভ্যাট, আভন আর ক্যান্ডি ট্রে দেখতে পেল নাদিয়া। দেয়ালে গরু আর শিশুর ছবি আঁকা—জার্মানদের কল্পনায় যে-দুটো জিনিস খুব সহজে চলে আসে। কাল সকাল আটটায় সাদা অ্যাপ্রন পরা হাসিখুশি চেহারার নারী ও পুরুষে ভরে উঠবে এই কারখানা, লুবেকের বিখ্যাত মারজিপ্যান তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তারা।

'বারবার মনে হয়েছে তুমি আসলে একটা পাগল,' বলল সে। 'তারপর উপলব্ধি করলাম, আমার ধারণা ভুল, তুমি আসলে প্রায় জাদুর মত যে-কোন সমস্যাকে সহজ করে নাও…নিতে পারো—অন্তত এখন পর্যন্ত পেরেছ।'

রানা নিজের কাজে ব্যস্ত।

'ওটা তুমি কী করছ?'

'মিক্সচার নিউট্রালাইজ করার জন্যে ক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করছি। কাজ করার জন্যে এটাকেও খানিক সময় দিতেই হবে।'

'এখন যদি জার্মান পুলিশ ঢোকে এখানে?' জানতে চাইল নাদিয়া। 'কী করবে তুমি?'

'তোমার বেরেটা কোথায়? সঙ্গে আছে তো?'

ওভারঅলের পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করল নাদিয়া।

'গুড। লুকিয়ে রাখো ওটা, নাদিয়া। কেউ যদি নক করে দরজায়, তাকে বলা হবে আমরা ক্যান্ডি তৈরি করছি। সে যদি বেশি সন্দেহে পড়ে যায়, তাকে আমরা খেয়ে দেখতে বলতে পারি। কামড় দেয়ার পর হয়তো এক কি দু'পা এগোতে পারবে, তারপর ঢলে পড়বে মেঝেতে।'

'কিন্তু সে যদি খেয়ে দেখতে রাজি না হয়?'

'সেক্ষেত্রে তাকে আমরা ভেতরে ঢুকে চেক করে দেখার অনুরোধ জানাব। যেহেতু মাস্ক পরে থাকবে না, এক মিনিট পর সে আর মনেই করতে পারবে না কী কারণে এখানে ঢুকেছিল। তবে তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ, এখানে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

'আর মাত্র দশ ঘণ্টা সময় পাব আমরা,' হাতঘড়ি দেখে বলল নাদিয়া। 'কতক্ষণ লাগবে এটার?'

'ক্যান্ডির ছাঁচগুলো এখন তুমি আনতে পারো।'

'ক্যান্ডির ছাঁচ?'

'হ্যাঁ। বললাম না, আমরা ক্যান্ডি বানাব। দেয়ালের ওই দিকটায়, ছাঁচের ট্রেগুলো শেলফে পাবে তুমি।'

'কথাটা আমি ফিরিয়ে নিলাম। তুমি সত্যি পাগল। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

তার কথায় কান না দিয়ে বিশাল বেকিং আভনের দিকে এগোল রানা। মেঝের চারভাগের এক ভাগ দখল করে রেখেছে ওটা। আবারও বিস্ফোরণ-নিরোধক স্তরে ডায়াল সেট করল ও। তারপর ভ্যাটের কাছে ফিরে এসে দেখল কয়েকটা ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাদিয়া, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে এদিক ওদিক।

'প্রতিবার মাত্র একটা ধরবে। পায়ের কাছে বালতি বসাও। হাতে একটা লেভেলার নাও। ভ্যাটের ট্যাপ খুলতে যাচ্ছি আমি। আমিই ছাঁচগুলো ভরব, উপচে পড়তে দেখলে লেভেলার দিয়ে সমান করবে তুমি, বাড়তিটুকু বালতিতে পড়ে যাবে। পরিষ্কার?'

যতই সন্দিহান হোক, কর্মী হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ নাদিয়া। আফিম ইতোমধ্যে হেরোইনে পরিণত হওয়ার যাত্রায় মাত্র অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে, তবে ঢালবার জন্য তৈরি। ভ্যাটের সবচেয়ে ছোট ট্যাপটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল রানা।

সাদা ক্রিম বেরিয়ে এল ট্রেতে। লেভেলার দিয়ে ক্রিম সমান করবার পর ভরাট ট্রে টেবিলে রেখে নতুন আর খালি একটা তুলে নিচ্ছে নাদিয়া। সন্দেহ বা প্রশ্ন করবার আর কোন অবকাশ নেই, এখন শুধু কাজ আর কাজ।

সকালে কারখানা শ্রমিকরা ফিরে আসবার আগেই পুরো দুশো বিশ পাউন্ড বেক করতে হবে, আর বেক করতে না পারলে ফেলে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে বাক্সেও ভরতে হবে সব, কারণ তা না হলে রানার কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যে ঠোকর দিয়ে কোন জার্মান গৃহবধূ আচ্ছন্ন বোধ করতে পারে।

শুয়োর, ডুমুর গাছের পাতা, গরু, শিশু, মাছ, আপেল, কলা, রুটি, নোঙর,

কিউপিড, আলু, আঙুর আর পিস্তলের ছাঁচসহ ট্রে রয়েছে। আভনে পঞ্চাশটার মত ট্রে ভরবার পর একটা ওয়াগন টেনে আনল রানা। ওটায় ভেজিটেবল কালারিং-এর স্প্রে ক্যান রয়েছে।

পনেরো মিনিট পর ট্রেগুলো আভন থেকে বের করে নিল রানা। ওদের 'ক্যান্ডি'-র বাইরের স্তর শক্ত হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট সময়।

'এ ঠিক নরম মিষ্টি!'

'মিষ্টি মিঠাই যাই বলো,' বলল রানা, 'প্রসেসিঙের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা রকম চেহারা পায় হেরোইন, এটা তার একটা। পার্থক্য শুধু, আমরা এটাকে মিঠাইয়ের স্তরে ধরে রাখছি কেমিক্যাল স্ট্যাবিলাইজারের সাহায্যে।'

'তারপর?'

'তারপর, এই মিঠাই যখন নিউ ইয়র্কে পৌঁছাবে, প্রসেসের সর্বশেষ পর্বটা সম্পন্ন করব আমরা–তখন আমাদের হেরোইন ধবধবে সাদা পাউডারের মত দেখাবে, যেমনটি দেখার জন্যে এই ক'টা দিন অস্থির হয়ে আছ তুমি।'

'মাস্ক পরে না থাকলে তোমাকে একটা চুমো দিতাম। আসলে ...দিতাম...আরও...অনেক...কিছু।'

'পরে, প্লিজ। এখন স্প্রে ক্যানটা ব্যবহার করো। চেষ্টা করো আলু যাতে ধূসর আর মাছ যাতে নীল হয়, উল্টোটা হলে সমস্যা।'

উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে ওরা। আটজন সাধারণ শ্রমিক আট ঘণ্টায় যা করতে পারত, নাদিয়ার সাহায্য নিয়ে সেই একই কাজ চার ঘণ্টায় সারল রানা। প্রতি আউন্স হেরোইন ঢেলে একবার বেক করা হলো, রঙ করবার পর বেক করা হলো দ্বিতীয়বার।

তারপর গরম ক্যান্ডি বাক্সে ভরল ওরা। প্রতিটি বাক্সের শুধু তলার স্তরটা ভরা হলো। এত তাড়াহুড়ো করা সত্ত্বেও, দেখা গেল, সকালের শিফট শুরু হতে আর মাত্র দু'ঘণ্টা বাকি আছে।

আগের দিন তৈরি করে বাক্সে ভরে রাখা নির্ভেজাল মারজিপ্যান থেকে শুধু উপরের স্তর নিল রানা, তা দিয়ে চাপা দিল নিজেদের হেরোইন ক্যান্ডি। হাতে আর মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে, অথচ সবচেয়ে জটিল কাজটাই এখনও বাকি।

নাদিয়াকে নিয়ে রানা চলে যাওয়ার পর হেরোইনের একটা কণা পর্যন্ত যেন কেউ না পায় এখানে। ভ্যাট আর ওটার চারপাশ নিখুঁত ভাবে পরিষ্কার করল নাদিয়া। স্টক থেকে নিয়ে ভেজিটেবল কালারিঙের ক্যান রিফিল করা হলো। ট্রেগুলো ধুলো রানা, নতুন বাক্স আনল স্টক থেকে। তারপর আভন সহ গোটা কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হলো সমস্ত ভাপ, বাষ্প আর বাতাস।

অতিরিক্ত বা নষ্ট ক্যান্ডি, বাক্স, ওভারঅল আর গ্যাস মাস্ক ইনসিনারেটার শুটে ফেলে দিল রানা।

'কিন্তু আভনটা?' জানতে চাইল নাদিয়া। 'ওটার কী হবে? আমরা চলে যাবার পরও গরম থাকবে ওটা।'

'পুরানো হলে থাকত। এটা গ্যাস হিটেড আর ওয়াটার কুলড্। আর আট মিনিট আছে। চলো, নাদিয়া, পালাই।'

বাইরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। রাস্তার প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে, এই সময় সাদা অ্যাপ্রন পরা দু'জন মহিলা শ্রমিককে কারখানার দিকে হাঁটতে দেখল ওরা, পিঠে কোম্পানির নাম ছাপা রয়েছে।

নিজেকে নিঙড়ানো ভেজা ন্যাকড়ার মত লাগল রানার।

তবে নাদিয়ার উল্লাস হলো দেখবার মত। 'অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, তুমি একটা জিনিয়াস!' পারলে গাড়ির ভিতরই নাচতে শুরু করে।

'তুমি একটা জিনিয়াস!' হোটেল স্যুইটে ফিরবার পরও নাদিয়ার মুখে সেই একই কথা লেগে আছে। 'তুমি যদি শুধু মাসে একবার এই বিশেষ ক্যান্ডি তৈরি করো, গোটা উত্তর আমেরিকার মার্কেট তোমার মুঠোর ভেতর চলে আসবে। হেরোইনের বন্যা বইয়ে দিয়ে বাকি সবাইকে ব্যবসা থেকে ভাগিয়ে দিতে পারবে।'

ধপাস করে বিছানায় চিৎ হলো রানা। শুধু ওজনের ভারে বন্ধ হয়ে এল চোখের পাতা।

নাদিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। তার উল্লাস আর নেশা কাটছে না। 'কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছ তুমি, আরসালান? ঠিক এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেছেন আমার গুরু। তুমি হতে পারো ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ। আর, আমার সাহায্য পেলে, দুনিয়ার কারও শক্তি নেই তোমাকে থামায়।'

ঝট করে বিছানায় উঠে বসল রানা। 'তোমার গুরু, মানে সেই বাবা...ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি আমার সম্পর্কে এ কথা বলেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল নাদিয়া। 'কিছুই আর গোপন করব না, আরসালান। হ্যাঁ, আমার গুরুই ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি। তিনি বলেছেন, তুমি চাইলেই এই দুনিয়ার অন্ধকার জগতে সম্রাট হতে পারবে।'

'আমি সব কথা শুনতে চাই, নাদিয়া। শেলি কার হাতে খুন হয়? গাইড সদাশয় গুপ্তকে কে ছুরি মেরেছিল? রাজীব ত্রিপাঠি গায়েব হয়ে কোথায় গেলেন? এত বছর পর দীঘায় আরেকজন খুন হলো–কেন?'

'সবই বলব, আরসালান। কিন্তু প্রস্তুত হবার জন্যে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। প্লিজ।' বুকে হাতের চাপ দিয়ে আবার রানাকে বিছানায় শুইয়ে দিল নাদিয়া।

ক্লান্ত রানা নাদিয়ার কথা মেনে নিল।

অতি সহজ অথচ অবিশ্বাস্য একটা প্ল্যান সফল হতে চলেছে। কর্সিকান আর ইউরোপের অর্ধেক কাস্টমস সিস্টেমকে হারিয়ে দিয়েছে রানা। ওর তৈরি মারজিপ্যান লুবেক ইন্সপেকশন অনায়াসে উতরে যাবে।

ফাহিম আরসালান এখন মাফিয়ার শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত। রানা অনুভব করল নাদিয়া ওর চাদরের তলায় ঢুকে পড়ছে।

পরস্পরের বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। রানা, সাবধান! মনের ভিতর থেকে কে যেন ফিসফিস করল। আপন মনে মাথা ঝাঁকাল রানা।

দশ

'আমি জানতাম তুমি পারবে, আরসালান। বৈরুতে, সেই প্রথম দিনই আমি বলেছিলাম, সফল হবার জন্যে যা-যা দরকার সবই তোমার মধ্যে আছে।'

মাফিয়া ডন আলবার্ট ডি' মোনা কার্টিস গ্লাসটা আবার ভরে দিয়ে রানার পিঠ চাপড়াল। দু'হপ্তা আগে হলে তার এই হাতে হয়তো ছুরি থাকত, কিংবা পিস্তল। এই মুহূর্তে তার আচরণে বন্ধুত্ব উথলে উঠছে।

গোটা হলরুম মাফিয়া স্টাইলে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে আছে। ডি' মোনার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে নিউ ইয়র্ক, নিউ ইংল্যান্ড আর মিডল আটলান্টিক থেকে বত্রিশজন মাফিয়া পরিবারের কর্তা বা চিফ উপস্থিত হয়েছে এখানে। তাদেরকে নিজের একটা ব্যবসায়িক সাফল্য চাক্ষুষ করাবে ডি' মোনা, সেই সঙ্গে ডিসট্রিবিউশন রাইটও অফার করবে।

কর্তাদের পরনে দামী কাপড়ের সুট, কাফলিঙ্কে বসানো হীরে ঝিলিক মারছে, আঙুলের একেকটা আঙটি যেন বাঘের চোখ, কবজিতে প্রদর্শনীর উপযোগী রোলেক্স। ঠোঁটে মিটিমিটি রহস্যময় হাসি ঝুলিয়ে শিভাস রিগাল-এর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে নাদিয়া।

এতসব ফ্যাশন আসলে ক্ষমতার নমুনা ছাড়া কিছু নয়। ডি' মোনার বক্তৃতাটাও তাই।

নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু দালানগুলোর একটায় এই গোপন মিটিং ডাকা হয়েছে। ভাড়া নেওয়া হয়েছে পুরো একটা ফ্লোর।

'হেই, ট্যাকটিস,' বোস্টন থেকে আসা প্রৌঢ় এক ডন ডি' মোনার কনুই চেপে ধরল। ডি' মোনার ডাকনাম ওটা। 'তুমি বললে ভাগ পেতে হলে তাড়াহুড়ো করতে হবে। তা তোমার মাল এখানে পৌঁছাচ্ছে কবে?'

'আরসালান বলছে এক হপ্তার মধ্যে, ঠিক?'

'জিনিসটা বোটে আসছে,' জানাল রানা। 'আমি প্লেন নিয়ে চলে এসেছি, সবার সঙ্গে যাতে দেখা করতে পারি।'

'আমার সঙ্গেও খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে আলাপ ছিল ওর,' রানা থামতেই শুরু করল ডি' মোনা। হাততালি দিল সে। কামরায় উপস্থিত সবার মাথা তার দিকে ঘুরে গেল। 'দয়া করে সবাই আপনারা আপাতত মুখে কুলুপ আঁটুন। আমার একটা ঘোষণা আছে।'

কামরা নীরব হয়ে গেল।

'আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন এই ব্যক্তি, এই তরুণ তুরকির মধ্যে কী এমন দেখেছি যে তার অবাস্তব প্রস্তাবের পক্ষে দশ লাখ ডলার বাজি ধরলাম আমি? ওদিককার কোন অর্গানাইজেশন কখনও যা পারেনি, ও তা কীভাবে পারবে?

'ওর প্রস্তাব ছিল, দুশো বিশ পাউন্ড আফিম থেকে যে পরিমাণ হেরোইন তৈরি হয় তা এক চালানে নিউ ইয়র্কে ডেলিভারি দেবে। শুনে আপনারা সবাই একবাক্যে বলেছেন, এ অসম্ভব, কেউ কোনদিন পারেনি। কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। সবাই জানে এত বেশি মাল লুকানো সম্ভব নয়।

'কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনাদের কল্পনাশক্তি যথেষ্ট উর্বর ছিল না। তবে, এ-ব্যাপারে আর কিছু বলার আগে আমার মনে হয় খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার, কারণ আমি বেশ কিছু ক্ষুধার্ত মুখ দেখতে পাচ্ছি। ক্যান্ডি চলবে তো? কাকে আগে দেব, প্লিজ?'

টেবিলের দেরাজ থেকে এক বাক্স মারজিপ্যান বের করল ডি' মোনা। ঢাকনির গায়ে লাল টুকটুকে গাল নিয়ে একদল শিশু-কিশোর ক্যান্ডি খাচ্ছে, তার ছবি। কিনারায় জার্মান ভাষায় লেখা—"ডাফম্যান ওবারসি বেনিফিটের মারজিপ্যান শুধুমাত্র ডাফম্যান ওবারসি বেনিফিটই রপ্তানি করে।" এই বাক্সটা সারারাত হাড় ভাঙা খাটনির আংশিক ফসল।

'এটা কী? কৌতুক?' দু'একজন মাফিয়োসো কৈফিয়ত চাইল।

'এক টুকরো নিন।' সবচেয়ে অনাগ্রহী মেহমানের দিকে বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল ডি' মোনা।

'এখানে আমি ক্যান্ডি খেতে আসিনি।'

'আরে তাতে কী, নিন, ভাল লাগবে।' জিদ ধরল ডি' মোনা। 'খান,' শেষ কথাটা একটু যেন কর্কশ কণ্ঠে, প্রচ্ছন্ন ধমকের সুরে।

মাফিয়োসো, এক পরিবার প্রধানের ছেলে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাক্স থেকে একটা টুকরো নিল। কামড় দিল সে, চিবাল, তারপর থো থো করে ফেলে দিল কার্পেটে। 'গড, আপনি আমাকে কী খেতে দিয়েছেন?'

'কেন, মারজিপ্যান।' হেসে উঠল ডি' মোনা। 'আপনি আগে কখনও মারজিপ্যানের নাম শোনেননি?'

'আসল কথায় এসো,' ভিড়ের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ কর্তৃত্বের সুরে বলল।

এবার ডি' মোনা বাক্সের নীচের স্তর থেকে এক টুকরো ক্যান্ডি তুলে নিয়ে তরুণ মাফিয়োসোর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'আমি চেখেছি।'

'আবার চাখুন।'

গম্ভীর একটা ভাব নিয়ে ডি' মোনার ভিক্টিম নতুন টুকরোয় ছোট্ট একটা কামড় দিল। আবার থো করে কার্পেটে ফেলল, তবে এবার সে জানে কী জিনিস মুখে দিয়েছিল। 'জেসাস! খাঁটি স্নো! এ তো নির্ভেজাল হেরোইন!'

ডি' মোনা অবশিষ্ট টুকরোটা তরুণ মাফিয়োসোর বাবা, বোস্টনের ডনকে দিল। অতিথিদের সবাই এখন এগিয়ে এসে দেখতে চাইছে ক্যান্ডি বক্সের ভিতরটা।

'জিনিসটা সেমি-প্রসেসড্ আফিম,' শিকাগোর একজন জ্ঞানপাপী বলল। 'কিন্তু তারপর এটার ওপর তুমি আরও কারিগরি ফলিয়েছ।'

'ভেজিটেবল কালারিং আর স্ট্যাবিলাইজার। এখানে প্রসেসিং করার সময় ও-

সব বেরিয়ে আসবে,' জানাল রানা।

শিকাগোর বস আঙুলের গিঁট দিয়ে কপালের চওড়া হাড়ে আঘাত করল। 'আমার ব্লাডপ্রেশার দুশোর ঘর ছাড়িয়ে যাচ্ছে!' বিস্ফোরিত হলো সে। 'একটা বাক্সের দাম পড়ছে কত? বিশ লাখ ডলার?'

'প্রায়,' বলল রানা। 'সবগুলো বাক্সের ওপরের স্তরে রয়েছে খাঁটি মারজিপ্যান। কোনভাবেই ব্যাপারটা ধরতে পারবে না কাস্টমস। এক্স-রে কোন সাহায্যে আসবে না, কারণ কিছুই লুকানো হয়নি। কুকুরও কোন কাজে আসবে না, কারণ হেরোইনের গন্ধ চাপা পড়ে গেছে আমন্ডের সুবাসে। তা ছাড়া, সব দেশের কাস্টমসই আসলে কনটেন্টস স্লিপ দেখতে চায়। ইমপোর্টেড মারজিপ্যানের জন্যে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আগেই আমরা ফাইল জমা দিই, তারা পরীক্ষা করে আমাদেরকে স্লিপ দেয়। সেই স্লিপে কাস্টমস সিল-ছাপ্পড় মারে। আমাদের কাছে চার দেশের এই রকম স্লিপ আছে, যেগুলোয় নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে আমন্ড পাউডারে কোন রকম ভেজাল ছিল না। শিপমেন্টটা কেউ হাইজ্যাক না করলে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

রানা থামতে কামরার ভিতর হইচই শুরু হয়ে গেল, সবাই একযোগে কথা বলছে। গলা চড়িয়ে সবাইকে থামতে বলল ডি' মোনা।

'হাইজ্যাক শব্দটা দিয়ে তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাইলে?' রানাকে প্রশ্ন করল ডি' মোনা। 'শিপমেন্ট সম্পর্কে যারা জানে তারা সবাই এই কামরায় উপস্থিত রয়েছে। তা হলে তোমার স্নো কে এখানে হাইজ্যাক করতে চাইবে?'

'তুমি,' বলল রানা। 'তুমি চাইবে।'

নিজের বুকে তর্জনী তাক করল ডি' মোনা। 'আমি? ওটা আমার মাল। আমি কেন তা হাইজ্যাক করতে যাব?'

'কারণ, ওটা তোমার মাল নয়। তুমি আমার পার্টনার নও।'

আশপাশে যারা রয়েছে দ্রুত তাদের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল ডি' মোনা। দৃষ্টি অবশ্য রানার মুখেই ফিরে এল। 'এটা কি তা হলে একটা ডাবল ক্রস? আমরা একটা চুক্তিতে এসেছি, তুরকি, এবং তুমি সেই চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য।'

'তুমিই চুক্তিটা ভঙ্গ করেছ, মিস্টার ডি' মোনা আমরা পার্টনার হবার পর আমার পিছনে অন্তত চারটে খুনীকে পাঠিয়েছ তুমি। কাজেই কোন চুক্তির আর অস্তিত্ব নেই। তোমার দশ লাখ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে।'

ডি' মোনার লাল চামড়া আরও লাল হয়ে উঠেছে। খেপা ষাঁড়ের মত প্রায় গুঁতিয়ে নিজের পথ থেকে সরাল সবাইকে, এসে দাঁড়াল নাদিয়ার সামনে।

নাদিয়া সোনালি মখমল মোড়া সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে, আদুরে একটা বিড়ালের মত লাগছে তাকে।

'ও মিথ্যে কথা বলছে,' তাকে বলল ডি' মোনা। ওদের সবাইকে তুমি জানাও আরসালান সত্যি কথা বলছে না।'

হাতের গ্লাসটা ধীরে-সুস্থে সোফার হাতলে নামিয়ে রাখল নাদিয়া, মাথা ঝাঁকিয়ে পিঁয়াজ রঙের চুল সরাল কপাল থেকে, তারপর পটলচেরা চোখ তুলে

পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল ডি' মোনার দিকে। 'আরসালান তো আসলে সত্যি কথাই বলছে, আলবার্ট। আমি যখন রওনা হলাম, তুমি বললে—আফিম কোথায় লুকানো হয় জানার পর আরসালানকে খতম করে দিয়ো। তারপরও তুমি তিনজন কর্সিকানকে পাঠিয়েছিলে কাজটা করার জন্যে। তবে তারা নয়, আরসালানই তাদের ব্যবস্থা করেছে।'

'আর তুমি? তোমার ব্যাপারটা কী?' অসম্ভব মনে হলেও, ডি' মোনার মুখ আরও লাল হলো।

'আমি সিদ্ধান্তে আসি, আরসালান কিছু বাড়িয়ে বলছে না; বুঝতে পারি সত্যি হেরোইন আনতে পারবে সে। কাজেই, অর্গানাইজেশনের স্বার্থে, তোমার পরামর্শ আমি মানিনি।'

'শালা তুরকি!' বন করে ঘুরে রানার দিকে তেড়ে এল ডি' মোনা।

রানা অপেক্ষা করছে, লোকটা ওর নাগালের মধ্যে আসুক। কিন্তু তার আগেই দু'জনের মাঝখানে চওড়া একজোড়া কাঁধ ঢুকে পড়ল।

'তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, ট্যাকটিস,' বলল বোস্টনের সেই প্রৌঢ় ডন, 'তুমি এখন আর ওর পার্টনার নও। তার মানে তো যার সঙ্গে ইচ্ছে আরেকটা চুক্তি করতে পারবে ও।'

মাফিয়া পরিবারের অন্যান্য কর্তারা সবাই তার কথায় সায় দিল। ডি' মোনা এই অনুষ্ঠান বা মিটিঙের মেজবান, সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে, অথচ এই মুহূর্তে তাকে অবাঞ্ছিত আগন্তুক বলে মনে হচ্ছে সবার।

'এই নতুন চুক্তি তা হলে কীভাবে করব আমরা?' মায়ামির একজন কাপতান জানতে চাইল, নাকটা একদিকে বাঁকা তার। 'প্রথম দফায় প্রায় একশো কিলো শিপমেন্ট। এক মাস পর আরও একশো কিলো। শুধু তোমার পাওনা মেটাতেই সমস্ত ব্যাঙ্ক খালি করে ফেলতে হবে, আরসালান। হেল, ডেলিভারির সময় যদি বিশ মিলিয়ন দিতে হয়, তুমি বছরে দাবি করছ দুশো চল্লিশ মিলিয়ন।'

'তবে পার্টনারের জন্যেও এতে প্রচুর লাভ রয়েছে,' বাধা দিয়ে বলল বোস্টন পরিবারের উপদেষ্টা। 'বাজারদর হিসেব করো। দু'হাজার চারশো মিলিয়ন ডলার। প্রধান ডিস্ট্রিবিউটর দেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসাটা নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে, যে পরিবার দায়িত্বে থাকবে, তাকে ইস্ট কোস্টের পোর্ট থেকে অপারেট করতে হবে।'

'যে-কোন পোর্ট থেকেই অপারেট করা সম্ভব,' লস অ্যাঞ্জেলিসের ডন এই প্রথম মুখ খুলল।

'প্রথম শিপমেন্ট যেহেতু নিউ ইয়র্কে আসছে, কাজেই প্রধান ডিস্ট্রিবিউটর এখানকার কেউ হতে হবে,' বলল ডি' মোনার একজন স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী।

'আপনাদের অনুমতি নিয়ে,' গলা চড়িয়ে বলল রানা, 'সবাইকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, ক্যান্ডির প্রথম চালান পৌঁছাতে এক হপ্তা সময় লাগবে। এটা খুব বেশি সময় নয়, তবে এই সুযোগে আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন কে কী দর হাঁকবেন।'

'দর হাঁকব?'

'হ্যাঁ। যেহেতু আমার কোন পার্টনার নেই, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডিস্ট্রিবিউশন রাইট নিলামে চড়াব। নিলাম অনুষ্ঠিত হবে আজ থেকে পাঁচ দিন পর। তাতে যে-কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে।'

'এ-ধরনের সমাবেশ বিপজ্জনক,' লস অ্যাঞ্জেলিসের চিফ প্রতিবাদ জানাল। 'অ্যান্টি নারকোটিক স্কোয়াড আর এফবিআই তো পিছু নেয়ই, ব্যক্তিগত শত্রুরাও সুযোগের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ওঠে। নিলাম আপনার জন্যে ঠিক আছে, কিন্তু এটা দাম চড়িয়ে দেয়। আমাদের জন্যে এটা ইমপসিবল।'

'না, আসলে তা নয়।' গ্লাসের ভিতর বরফের টুকরোগুলোকে ঘোরাচ্ছে নাদিয়া। 'সবার জন্যে নিরাপদ এমন জায়গা আছে তো, সেখানে বসতে পারেন আপনারা—রাত্রির ওখানে।'

বরফের টুকরোগুলো গ্লাসে লেগে আওয়াজ করছে, কামরার ভিতর আর কোন শব্দ নেই।

মাফিয়া চিফরা একদিকে লোভ, আরেক দিকে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে পড়ে গেছে। এক অর্থে, তাদের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। রানার প্রস্তাবিত নারকোটিকের ঢল অন্য কোন পরিবারকে সংগ্রহ করতে দেওয়ার অর্থ হলো, প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে অঢেল টাকার মালিক হতে দেখা। আর টাকা দিয়ে 'সোলজার' কেনা যায়।

রানার চিন্তা-ভাবনা অবশ্য অন্য রকম। চালানটা তুরস্ক থেকে জার্মানিতে নিয়ে এসেছে ও। পথে আততায়ীদের খুন করতে হয়েছে। এখন ওর নাগালের মধ্যে চলে আসছে পুরস্কার। সেই পুরস্কারের নাম রাত্রি। এই শব্দ দুটো অনন্য রায়হানের পাঠানো খামে পাওয়া গিয়েছিল। গতকাল ডি' মোনার বিরুদ্ধে প্ল্যান তৈরি করবার সময় নাদিয়াও আবার শব্দটা উচ্চারণ করেছে।

রাত্রি শুধু রাজীব ত্রিপাঠির সংক্ষেপ নয়, এর আরও অনেক বড় তাৎপর্য আছে বলে রানার ধারণা। শব্দটাকে, কিংবা হয়তো শব্দটার পিছনের মানুষটাকে কেউ সম্ভবত কাভার হিসাবে ব্যবহার করছে।

রাত্রি নিরাপদ আশ্রয়, ক্যাসকেইড পার্বত্য এলাকার কোথাও মার্কিন মাফিয়ার অলঙ্ঘ্য হেডকোয়ার্টার।

'হয়তো,' পশ্চিম উপকূলের চিফ নীরবতা ভেঙে বলল, 'সেটাই সবার জন্যে ভাল। সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে গোপনে কেউ কোন চুক্তিতে আসতে চেষ্টা করবে না।'

'রাইট,' বোস্টন চিফ তাকে সমর্থন করল। 'সবাই নিলামে অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে, এই সমাঝোতায় যে ফলাফলের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে বাধ্য থাকব আমরা। নিলামে যে জিতবে সে বোধহয় ওই জার্মান কোম্পানিটার শেয়ার পাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'সাবধান!' ডি' মোনার গর্জন এত বড় ঘরটাকে যেন কাঁপিয়ে দিল। 'তোমরা জানছ কীভাবে যে গোটা ব্যাপারটা আসলে ফাঁদ নয়? ওই তুরকি শালা হয়তো সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করছে ফেডারেল পুলিশের হাতে

সব ক'টাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে।'

সমবেত মাফিয়োসোরা একযোগে হেসে উঠল।

'আঙুর,ফল টক, তাই না, ট্যাকটিস? সত্যি, তোমার কপাল মন্দ।'

'তা ছাড়া,' আরেকজন বলল, 'রাত্রিতে আমাদের নাগাল পাবার কোন উপায় নেই কারও, এমনকী সেনাবাহিনীও ওখানে আমাদেরকে ছুঁতে পারবে না।'

এগারো

প্যান অ্যাম ফ্লাইট ওদেরকে স্পোকেন পর্যন্ত পৌঁছে দিল। স্কি ইকুইপমেন্ট কিনল ওরা, তারপর একটা চার্টার প্লেন নিয়ে আরও মাইল পঞ্চাশেক এগোল। ওদেরকে একটা হিমায়িত লেকে নামিয়ে দিয়ে প্লেন নিয়ে চলে গেল পাইলট। এখন অপেক্ষা।

বাতাসে ছুরির ধার। লেকটা কয়েক হাজার বছর ধরে জমাট বেঁধে আছে। দানব বা রাক্ষসের সারি সারি উঁচু-নিচু দাঁতের মত পাহাড়ের চূড়াগুলো মাথাচাড়া দিয়ে আছে পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের গায়ে। জায়গাটা দশ হাজার ফুট উঁচু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ পর্বত-মালা, এখনও যেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি বলে ধারণা করা হয়।

নেকড়ের ছাল দিয়ে বানানো কোট গায়ে বেশ আরামেই আছে নাদিয়া।

'তুমি অনেকবারই আমার সম্পর্কে সব কথা জানতে চেয়েছ,' বলল সে, বাতাস জমাট বেঁধে যাওয়ায় প্রতিটি শব্দ বাষ্পের আদলে দেখা যাচ্ছে। 'এখন জানবে। শুরুতেই বলি, এখন থেকে আমি আর নাদিয়া গারফিল্ড নই। আমার নাম নাদিয়া ক্যামপেরো।'

রানা কিছু বলবার আগে চারপাশের বাতাসে একটা কম্পন শুরু হলো। বরফ ঢাকা লেক প্রায় ছুঁয়ে ছুটে এল হেলিকপ্টারটা। সরু, বল্লম-আকৃতির নাকে একটা মেশিনগান ফিট করা রয়েছে। নাকের নীচে ঝুলে আছে গ্রেনেড লঞ্চার। এখানেই শেষ নয়। সরু ফিউজিলাজের দু'পাশে রকেট পডও দেখা যাচ্ছে। এই কোবরা হেলিকপ্টার কোনমতেই সিভিলিয়ান নয়।

কাছাকাছি এসে পড়ল ওটা। মেশিনগান ওদের বুকের দিকে ঘুরে গেল। একটা হাত তুলে নাড়ল নাদিয়া। নাক নিচু করে আরেক দিকে চলে গেল কোবরা।

আরেকটা কপ্টার হাজির হলো, সন্দেহ নেই রেডিওর মাধ্যমে পাইলটকে জানানো হয়েছে সিকিউরিটি নিয়ে কোন সংকট নেই। এই গাঢ় নীল যান্ত্রিক ফড়িংটা প্যাসেঞ্জার ক্যারিয়ার, ব্লু ডাক নামে পরিচিত। প্যাসেঞ্জার ক্যারিয়ার হলেও, এটার সঙ্গেও একজোড়া মেশিনগান ফিট করা আছে। ওদের মাথার উপর বারকয়েক চক্কর দিয়ে নীচে নামল ওটা।

'ওয়েল কাম অ্যাবোর্ড, মিস ক্যামপেরো।' হাত ধরে নাদিয়াকে কপ্টারে

উঠতে সাহায্য করল পাইলট। দুই গানার, পাইলট আর কো-পাইলটের পরনে গাঢ় নীল রঙের ইউনিফর্ম। রানা কারও সাহায্য ছাড়াই ভিতরে ঢুকল।

'এবার সরাসরি আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাব, আরসালান।' রানার একটা হাত ছুঁলো নাদিয়া।

বোতাম টিপতেই সাজানো একটা ছোট্ট বার বেরিয়ে পড়ল। কপ্টার আবার আকাশে উঠছে, রানার জন্য একটা গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালল নাদিয়া। 'নাও, শরীরটা গরম করে নাও।'

একের পর এক পাহাড়ী ঢেউ, চারদিকে যত দূর দৃষ্টি যায় যেন খেপা একটা সাগর পাথরে পরিণত হয়েছে। বরফ আর তুষারে সূর্যের প্রতিফলন পড়ায় চূড়াগুলো ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চাইছে।

'ভারী সুন্দর, তাই না?' জিজ্ঞেস করল নাদিয়া। 'দক্ষিণে স্নোকিং পাহাড়। পশ্চিমে ডিসপেয়ার, রিডাউট আর ট্রায়াম্ফ। ডেভিল'স ডোম পুবদিকে।'

'রাত্রি কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'আমার যদি বুঝতে ভুল না হয়, ওটা শুধু কোন মানুষের নাম নয়, একটা জায়গার নামও।'

'ঠিক ধরেছ। নামটা আমার বাবার দেয়া।' হেসে উঠল নাদিয়া। 'তুমি শুধু চোখ দুটো খোলা রাখো, তা হলেই দেখতে পাবে। জায়গাটার আগের নাম ছিল স্নোম্যান।'

বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়ার উপর দিয়ে আরও বিশ মিনিট উড়ল ওরা। কপ্টার ক্রমশ উঁচুতে উঠছে। রেডিও অন করল পাইলট। পিছনে তাকিয়ে কোবরাকে দেখতে পেল রানা, লক্ষ রাখছে পিছু নিয়ে কিছু আসছে কিনা। ওদের ব্লু ডাক আরও দ্রুত বেগে উঠছে, এগোচ্ছে উঁচু একটা চূড়ার দিকে।

চূড়াটাকে ডিঙিয়ে এল কপ্টার। পাহাড়ের মাথাটা যেন করাত চালিয়ে সমান করা হয়েছে। পাথর আর বরফ নয়, ও-সবের বদলে শ্বেত পাথরের তৈরি অত্যাধুনিক একটা অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে রাজকীয় প্রাসাদের আভিজাত্য, ভাবগাম্ভীর্য আর দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যকীর্তি নিয়ে।

প্রাসাদ হলেও, যেহেতু আধুনিক, যেখানে শ্বেত পাথর ব্যবহার করা হয়নি সেখানে শুধু কাঁচ দেখা যাচ্ছে—অবশ্যই বুলেটপ্রুফ। প্রাসাদটাকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে কয়েক সারি সিডার গাছ। আরেক দিকে গভীর খাদ।

কপ্টারের ফ্লাইটকে অনুসরণ করছে ছাদে ফিট করা মেশিনগানের একজন গানার। লোকটা স্বচ্ছ একটা বুদ্‌বুদের ভিতর বসে আছে।

শ্বেত পাথরের অট্টালিকার পর একটা ঢাল পড়ল, ক্রমশ নিচু হয়ে নেমে গেছে আরেক পাহাড়ের গোড়ায়। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গাটা কয়েক মাইল লম্বা, তবে চওড়ায় খুব বেশি নয়।

বরফের একটা ঝুলন্ত ছাদ দেখা গেল। সেটা পেরিয়ে আসতে এক এক করে উন্মুক্ত হলো নীচের ল্যান্ডিংপ্যাডগুলো।

প্রতিটি ল্যান্ডিংপ্যাডের সঙ্গে এক প্রস্থ করে পাকা রাস্তা রয়েছে। উঠে গেছে প্রাসাদের দিকে। রাস্তার পাশে তৈরি করা হয়েছে ছোট ছোট ধাপ; সিঁড়িগুলোও বাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

সব মিলিয়ে সাতটা ল্যান্ডিং প্যাড দেখতে পাচ্ছে রানা। প্রতিটি প্যাডের নকশা আলাদা, একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই। ধবধবে সাদা বরফের উপর নীল আর হলুদ ল্যান্ডিং প্যাডগুলো এমন একটা আকৃতি তৈরি করেছে, যা শুধু আকাশ থেকে তাকালেই দেখা যাবে।

ধ্যানে বসা একজন সাধুর প্রতিমূর্তি।

ওই প্রতিমূর্তির ভাঁজ করা পায়ের সামনে বরফ থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে, শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরি বাংলা বর্ণমালার দুটো হরফ দেখা যাচ্ছে—'রাত্রি'।

ব্লু ডাক ল্যান্ড করল। ওদের গানার বে উইন্ডো খুলে দিল। প্রথমে নীচে নামল নাদিয়া। 'ড্যাডি?'

প্যাডে ওদের জন্য দু'জন লোক অপেক্ষা করছে। একজন নীল ইউনিফর্ম পরা বডিগার্ড, কাঁধে রয়েছে এম-সিক্সটিন। অপর লোকটার বয়স হয়েছে, একজোড়া বৃষস্কন্ধের মালিক। গায়ের রঙ তামাটে, মাথায় রুপালি চুল, চোখ দুটো কালো আর নাকটা রোমান। চেহারায় আভিজাত্য আছে, তবে সেটাকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে ক্ষুরের মত ধারাল বুদ্ধির ছটা আর নির্দয় একটা ভাব, প্রায় রোদের মত গরম আঁচ লাগল রানার অনুভূতিতে।

আচ্ছা, এই লোকই তা হলে নাদিয়ার বাবা।

মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার ভঙ্গিতে তার কাঁধে একটা হাত রাখল সে, তারপর দৃঢ় করমর্দনের সময় কঠিন দৃষ্টিতে মেপে নিল রানাকে।

'মিস্টার ক্যামপেরো, আমি ফাহিম আরসালান।'

'সেরকমই শুনছি বটে,' তুরকি ভাষাতেই জবাব দিল সে। 'যদিও যা শুনি তার খুব কমই বিশ্বাস করি আমি। আপনার কি মনে হয়, সেটাই উচিত নয়?' মেয়েকে আরেকটা চুমো খেয়ে ভাষাটা বদলে ইংরেজি করল। ভাষা যাই হোক, ইটালিয়ান বাচনভঙ্গি থাকছেই। অন্যান্য মাফিয়োসো নিজেদের ভাষার টান গোপন করবার চেষ্টা করে, এই লোক তার ব্যতিক্রম। 'ফ্রেঞ্চ বন্ধুদের কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে আমি অদ্ভুত সব রিপোর্ট পেয়েছি।' মেয়ের দিকে তাকাল। 'নাদিয়া, মাইডিয়ার, ড্যাডিকে তোমার অনেক কথা বলার আছে—নিজের সম্পর্কে, তোমার নতুন বন্ধু সম্পর্কেও। এসো।'

ধাপ বেয়ে উঠবার সময় ক্যামপেরো দেখল মাথার উপর ঝুলে থাকা কোবরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'আপনি ওড়াউড়ি পছন্দ করেন, মিস্টার আরসালান?'

'মাঝে-মধ্যে,' বলল রানা। 'ভাবছিলাম, ওটা আপনি পেলেন কীভাবে।'

'অনেক পুরানো বলে পেন্টাগন বেশ কিছু কোবরা আফ্রিকায় বিক্রি করেছিল, আমি ওখান থেকে সংগ্রহ করেছি। দাম পড়েছে দশভাগের এক ভাগ।'

'তাও তো পাঁচ লাখ ডলার।'

'ব্রাভো, মিস্টার আরসালান! অনুমান করে আসল অঙ্কের এত কাছাকাছি কেউ আসতে পারে না। নাদিয়া, আমার ধারণা তোমার তুরকি বন্ধু কিছুটা সময় অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'

সিঁড়ির ধাপগুলো আর শ্বেতপাথরের থাকল না, খাঁজকাটা ইস্পাতের হয়ে গেল। এখান থেকে আসলে এসকালেটার, সচল সিঁড়ির শুরু।

এক ফালি সিডার বনকে পিছনে ফেলে বাড়ির ভিতর ঢুকল ওরা। লিভিংরুমটা অনেক বড়। তিনটে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। মেঝেতে কার্পেটের বদলে পশুর চামড়া। দেয়াল জুড়ে ছোট একটা লাইব্রেরি। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুটো বার।

পিকচার উইন্ডো দিয়ে ক্যাসকেইড পাহাড়ের দৃশ্য, মাঝে মধ্যে দু'একজন গার্ড বা এক-আধটা কোবরা দেখা যাচ্ছে। ক্যামপেরো একবার মাথা ঝাঁকাতে অপেক্ষারত ওয়েটার ওদের সামনে একটা মোবাইল বার ঠেলে আনল।

'হুইস্কি, মিস্টার আরসালান?'

'ভদকা, প্লিজ,' বলল রানা।

'এখানে তোমার সময়টা আনন্দে কাটবে,' ওকে বলল নাদিয়া। বাপের মত মেয়েও ওয়েটারের হাত থেকে হুইস্কি নিল। 'গেমরুম আছে, সনা আছে, আছে গরম সুইমিংপুল। ও, হ্যাঁ, শুটিং রেঞ্জও।'

'স্কিইং-এর কথাও বলো,' মেয়েকে মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল ক্যামপেরো। তারপর রানার দিকে ফিরল। 'আপনি স্কি করেন, মিস্টার আরসালান? নিলাম শুরুর আগে ঢাল থেকে আমরা একবার ঘুরেও আসতে পারি।'

'পারি,' সায় দিল রানা। 'তবে খুব একটা ভাল না।'

'পরিবার ছাড়া আপনিই প্রথম একজন বাইরের লোক যাকে আমরা এখানে দাওয়াত দিলাম। সমস্ত ব্যাপারে আমার মেয়ের ভয়ানক জিদ। ঠিক বাপেরই মত। আপনি ওকে প্রায় জাদু করেছেন। জাদু করেছেন পরিবার প্রধানদেরও। এবার আপনার কাজ আমাকে জাদু করা। বুঝতেই পারছেন, তা যদি না পারেন, এই জায়গা ছেড়ে আপনি কোনদিন ফিরতে পারবেন না।'

'সেটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি।'

'পারা উচিত। ওরা, চিফরা, মাঝে মধ্যে ছেলেমানুষির চূড়ান্ত করে ছাড়ে। ফ্রেঞ্চ নেটওঅর্ক তৈরি করতে কত বছর ধরে কী খাটনিটাই না গেছে, অথচ আপনার কাছে আরও ভাল একটা সিস্টেম আছে শুনে এই মুহূর্তেই সে-নেটওঅর্ক বাতিল করে দিতে চাইছে ওরা।

'আপনার প্রস্তাবে রাজি হবার আগে ওদের উচিত ছিল আমার সঙ্গে পরামর্শ করা, তেমনি নাদিয়ারও উচিত ছিল আমি কী বলি একটু শোনা।'

'দুঃখিত, ড্যাডি,' আন্তরিক, প্রার্থনার সুর নাদিয়ার কণ্ঠে। 'কিন্তু তখন তুমি এখানে ছিলে না···তা ছাড়া, গুরুজি বললেন, এর মধ্যে আমার কোন বিপদ নেই···'

'কিন্তু আমার আছে।'

'ড্যাডি! অসম্ভব! আমি তোমার কথাও গুরুজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম···'

'নিশ্চয় করেছিলে।' ক্যামপেরোর চোখ-মুখ থমথম করছে। 'এবং গুরুজি বলেছেন মিস্টার আরসালানের হাতে আমার মৃত্যু নেই।'

'না, নেই।'

'কিন্তু তিনি কি এ-কথাও বলেছেন যে মিস্টার আরসালানের লোকেদের হাতেও আমার মৃত্যু নেই? বলেছেন, তোমার তুরকি বন্ধুর পিছু নিয়ে কোনও

বাহিনী এই এলাকায় হামলা করতে আসছে না?'

বোবা হয়ে গেছে নাদিয়া। বাপের দিকে কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকবার পর রানার দিকে ফিরল সে। তারপর আবার বাপের দিকে চোখ ঘোরাল।

'গুরুজি ঠিক কী বলেছেন, সে-সব মিস্টার আরসালানের সামনে আলোচনা করাটা ঠিক হবে না,' নীরবতা ভেঙে বলল ক্যামপেরো। 'উনি যত বড় শত্রুই হন, এখানে আমাদের অতিথি। তাঁকে আমরা যদি খুনও করি, সেটা সসম্মানে করতে চাই।'

'খুন? আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলল নাদিয়া। 'তবে একটা কথা, ড্যাডি।'

'বলো।'

'আরসালানকে আমি কথা দিয়েছি গুরুজির সামনে ওকে একবার নিয়ে যাব।'

মাথা নিচু করে চিন্তা করছে ক্যামপেরো। প্রায় বিশ সেকেন্ড পর মুখ তুলল। 'ধ্যানে বসা অবস্থায়?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জবাব দিল নাদিয়া।

আবার চিন্তায় ডুবে গেল ক্যামপেরো। দশ সেকেন্ড পর বলল, 'ঠিক আছে। তবে আমার একটা শর্ত আছে, মিস্টার আরসালান।'

'কী শর্ত?' জানতে চাইল রানা।

'গুরুজি, ভগবান রাজীব ত্রিপাঠিকে আপনি দুটোর বেশি প্রশ্ন করতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে, তাই,' রানার হয়ে শর্তটা মেনে নিল নাদিয়া।

সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করল ক্যামপেরো। 'তবে গুরুজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হয়ে উঠবে।'

'না,' তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলল রানা। 'আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে চালানটা। হয় ওটা আমি আনতে পারব, নয়তো পারব না। তারপর থেকে আপনি পোপ না প্রেসিডেন্ট, তাতে কিছু আসে যায় না।'

পায়চারি থামিয়ে ক্যামপেরো বলল, 'ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি, মিস্টার আরসালান, কী করে আপনি এত দূর এলেন। নার্ভ আছে আপনার, এতে কোন সন্দেহ নেই।' মেয়ের দিকে ঘুরল সে। 'ওঁর ক্যান্ডির নমুনা আছে তোমার কাছে?'

চকমকে কাগজে মোড়া মারজিপ্যানের একটা বাক্স বাপের হাতে তুলে দিল নাদিয়া। ভিতরের জিনিসগুলো যাচাই করে দেখে বাক্সটা তাকে ফেরত দিল ক্যামপেরো।

'চতুর। তোমার মিস্টার আরসালান ভয়ানক চতুর লোক।' রানার দিকে তাকাল সে। 'ডি' মোনাকে বোকা বানিয়েছেন, এতে আমি অবাক হবার কিছু দেখছি না। ভাবছি আমাকে আপনি বোকা বানাবেন কী ভাবে? সাপারের সময় দেখা হবে।'

ওদেরকে রেখে অন্দর মহলে চলে গেল ক্যামপেরো।

সরে এসে রানাকে একটা হালকা চুমো খেল নাদিয়া। তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও ঝুঁকল সে, রানার মুখটা দু'হাতে ধরে নিজের দিকে টানল।

নাদিয়ার হীরের আঙটিটা রানার কানের লতিতে ঘষা খেল। নিজের অজান্তে

শিউরে উঠল রানা।

ব্যাপারটা টের পেয়ে হঠাৎ কাঠ হয়ে গেল নাদিয়া। 'কী হলো, আরসালান?'

'কই। কিছু না।' আগেই লক্ষ করেছে রানা, আঙটিতে হীরেটা বসানো হয়েছে একটা চৌকো ঘরের মাথায়। এ-ধরনের আঙটি আগেও দেখেছে ও, খুদে ঘরের ভিতর বিষ থাকে। 'তবে ভাবছি। তোমার ড্যাডি আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি কেন।' অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলোতেও নাদিয়ার আঙুলে এই আঙটি দেখেছে রানা। ওটা কী ওর মৃত্যুদণ্ডের রায় বহন করছে?

'ড্যাডি আসলে ভয় পাচ্ছে আমাকে তুমি তার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যাবে। কিংবা ভাবছে, আমি হয়তো স্বেচ্ছায় তার সাম্রাজ্য ছেড়ে তোমার হাত ধরে চলে যাব। দুটোই তার জন্যে আতঙ্ককর।'

সারা শরীরের এখানে-ওখানে অস্ত্র গোঁজা, একজন গার্ড এসে জানাল অতিথিকে সে তাঁর কামরায় পৌঁছে দেবে।

প্রাসাদের ভিতর ওর জন্য আলাদা একটা স্যুইট বরাদ্দ করা হয়েছে। কোন রকম লাগেজ আনবার অনুমতি পায়নি রানা। তবে ওয়ারড্রোবে সব ক'টা সাইজের বাছাই করা কাপড়চোপড় রাখা আছে। বাথরুমে পাওয়া গেল কমপ্লিট একটা টয়লেট কিট। স্টোররুমে স্কি সরঞ্জাম।

স্যুইটের বেশ ক'টা জানালার নীচে এক মাইল গভীর খাদ, খাড়া নেমে গেছে।

শাওয়ার সেরে প্রথমে দাড়ি কামাল রানা। তল্লাশী চালিয়ে বাথরুমে কোথাও ক্যামেরা নেই নিশ্চিত হওয়ার পর ইলেকট্রিক রেজারটা খুলল, ভিতরে লুকিয়ে রাখল বোতাম আকৃতির একটা ম্যাগনেটিক ট্র্যান্সমিটার। মেদিনিপুরে এটা ওকে ওর পুরানো বন্ধু হিউবার্ট দিয়েছে। রেজারের সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল না, হিউবার্টের বক্তব্য যদি সত্যি হয় তা হলে গোটা স্নোম্যান এলাকায় ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং একটা লো পাওয়ার ট্র্যান্সমিটারে পরিণত হবে। এএনএস, অর্থাৎ আমেরিকার অ্যান্টি নারকোটিক স্কোয়াডের একটা স্যাটেলাইট উত্তর আমেরিকার উপর বিশেষ নজর রাখছে। সিগন্যাল পাওয়ার পর নিজের পরিভ্রমণ পথ নিজেই বার বার শুধরে নেবে ওটা, যতক্ষণ না কমপিউটার রানার পজিশন নিঃসংশয়ে নির্ধারণ করতে পারে।

কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়েছে ও, একজন সেক্রেটারি ইন্টারকমে জানাল—সাপার রেডি।

কাঁচ দিয়ে মোড়া উঠানে বসে ক্যামপেরো আর নাদিয়ার সঙ্গে সাপার সারল রানা। উঠানটা একটা ঝুল-পাথরের শেষ মাথায়। খাবারটা ভিল মিলানিজ—ইটালির মিলান থেকে আমদানি করা কচি বাছুরের বাছাই করা মাংস। গলাধঃকরণের সুবিধার্থে রেড ওয়াইন। ওদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকল ক্যাসকেইড পর্বতমালা। পাহাড়গুলোর মাথা আর কাঁধের তুষারে ডুবন্ত সূর্যের রশ্মি লাগায় দাউ-দাউ আগুনের মত জ্বলছে।

ব্র্যান্ডি আর সিগার দেওয়ার জন্য টেবিল পরিষ্কার করা হলো। 'স্নোম্যান সম্পর্কে আপনার মনে হয়তো অনেক প্রশ্ন জাগছে, মিস্টার আরসালান,' বলল

ক্যামপেরো। 'মেজবান হিসেবে আপনার কৌতূহল মেটানোটা বোধহয় আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। প্লিজ, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'হ্যা, প্রশ্ন তো আছেই। যেমন—এই জায়গাটাকে আপনি লোকজনের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখছেন কীভাবে? জানি যে-কোন পথ থেকে অনেক দূরে এটা, অসম্ভব দুর্গমও, কিন্তু তারপরেও মাঝে-মধ্যে নিশ্চয়ই দু'একটা প্রাইভেট প্লেন কাছাকাছি চলে আসে। তারা তো আপনাকে দেখতে পাবেই।'

'না, পায় না। আর যদি পায়, রিপোর্ট করবার জন্যে ফিরে যেতে পারে না।' রানার প্রতিক্রিয়া হবে আশা করলেও, হতাশ হতে হলো ক্যামপেরোকে। 'কীভাবে কী হয় বলছি। লোকাল ওয়েদার ব্যুরোর কিছু অফিসারের পকেটে আমরা বেশ কিছু টাকা বিনিয়োগ করেছি। তারা এই এলাকা সম্পর্কে সব সময় একই রিপোর্ট দেয়—ঘন কুয়াশা থাকবে, দমকা বাতাসের আশঙ্কা আছে, তুষার ঝড় বইতে পারে। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর কে বেড়াতে আসবে এদিকে?

'তারপরও দু'একটা প্রাইভেট প্লেন যে মাঝে মধ্যে ভুল করে চলে আসে না, তা নয়; সেক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে ফেলে দেয়ার জন্যে আমরা একটা কোবরা পাঠিয়ে দিই। স্বভাবতই জানমালের ক্ষতি ঘটলে মেসেজটা আরও ভালভাবে উপলব্ধি করে সবাই—বেড়াবার জন্যে এদিকের আকাশ একটুও নিরাপদ নয়।'

'আক্রান্ত হলে পাইলট রেডিও মেসেজ পাঠায় না?'

'পাঠায় না আবার! কিন্তু পাঠালেও কোথাও যায় না। কারণ প্রথমেই আমরা সমস্ত রেডিও ট্র্যান্সমিশন জ্যাম করে দিই।' হাসল ক্যামপেরো। 'আর যদি সার্চ পার্টির কথা বলেন—সিভিল এয়ার পেট্রলেও আমাদের লোক আছে, প্লেনগুলোকে ভুল দিক নির্দেশনা দিয়ে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেয় ওরা।'

'প্রটেকশনের ভাল ব্যবস্থাই দেখছি করেছেন।'

'মিস্টার আরসালান,' অ্যাশট্রেতে সিগারের ছাই ঝাড়ল ক্যামপেরো, 'প্রটেকশনের এটা নিতান্ত ক্ষুদ্র একটা অংশ। আপনার মনে এ প্রশ্ন জাগছে না, এখানে যে নিরাপদ আশ্রয় আমি দিয়ে থাকি সেজন্যে মাফিয়া পরিবারগুলো আমাকে কী পরিমাণ টাকা দেয়?'

'ভাবছিলাম জিজ্ঞেস করাটা শোভন হয় কি না...'

'প্রতিটি পরিবার বছরে আমাকে দশ লাখ ডলার দেয়, খরচ-খরচা আলাদা। যাকে খুশি খুন করে একবার শুধু এখানে পৌছাতে পারলেই হয়, তার আর কোন ভয় নেই। এক অর্থে, নির্ঘাত মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখি আমরা। তাই টাকা দিয়ে যত উন্নত, সফিসটিকেটেড সিস্টেম কেনা যায়, এখানে তার সবই কাজে লাগানো হয়েছে। আমার সঙ্গে আসুন। জানি, ইন্টারেস্ট পাবেন আপনি।'

বারো

রাত্রি, অর্থাৎ স্নোম্যানের ত্রিশ ফুট নীচে রয়েছে ওরা। প্রকাণ্ড কামরাটা ইস্পাতের তৈরি, অনায়াসে পেন্টাগনের ওঅর-রুম বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কয়েক সারিতে দেড়শো কমপিউটার নিয়ে বসে আছে প্রোগ্রামাররা, তাদের সামনে আলোকিত মানচিত্রে দশ মাইল পরিধি জুড়ে দেখা যাচ্ছে পাহাড় আর পাহাড়, মাঝখানে স্নোম্যান।

একজন প্রোগ্রামারকে সরিয়ে দিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল ক্যামপেরো। সচল হলো সেটা। দুটো শব্দ ফুটল স্ক্রিনে–হিট সেনসরস্। জ্বলে উঠে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর বিভিন্ন পয়েন্টে নীল বৃত্ত আলোকিত হলো। আরও দুটো শব্দ জ্বলল–সাউন্ড সেনসরস্। আবার নীল বৃত্ত তৈরি হলো। 'কেউ যদি রাতের অন্ধকারে পাহাড় বেয়ে এদিকে আসে,' বলল সে, 'তা হলে লাল বৃত্ত দেখতে পাব আমরা। বলতে পারবেন, মিস্টার আরসালান, কী করব তখন আমরা?'

'আমি আপনার মুখ থেকে শোনার অপেক্ষায় আছি।'

'আমার অস্ত্র হলো তুষার, মিস্টার আরসালান। নিউক্লিয়ার বোমা, ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, এগুলো বাদে দুনিয়ার বুকে সম্ভবত তুষারই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র। তুষার সম্পর্কে কী জানেন আপনি, মি. আরসালান?'

'সাদা আর ঠাণ্ডা। তার বেশি আর কিছু না।'

'তা হলে শিখুন।' সারির দ্বিতীয় কমপিউটারের সামনে চলে এল ক্যামপেরো, চাপ দিল বোতামে। স্ক্রিন থেকে মানচিত্র গায়েব হয়ে গেল, তার বদলে আলোড়িত তুষার দেখা গেল, একশো গুণ ম্যাগনিফাই করা।

'তুষার কিন্তু এক রকম নয়। জাপানি বিজ্ঞানীরা উনআশি ধরনের তুষার চিহ্নিত করতে পেরেছে। তবে ইন্টারন্যাশনাল স্নো ক্লাসিফিকেশন স্কেল ব্যবহার করে মাত্র দশ ধরনের তুষার, আমাদের আলোচনা এই দশটার মধ্যেই সীমিত থাকুক।

'স্ক্রিনে এখন যে তুষার দেখতে পাচ্ছি, এটাকে বলে প্লেইট। ইনসেট-এ ইন্টারন্যাশন্যাল সিম্বল দেখতে পাচ্ছেন–হেক্সাগন।' আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে। 'স্টেলার ক্রিস্টাল, সমান্তরাল নক্ষত্রের মত। সিম্বলটা দেখুন–ছয় বাহু বিশিষ্ট তারা। প্লেইট আর স্টেলার তুষারই বেশির ভাগ সময় দেখে থাকি আমরা। বাকিগুলো সম্পর্কে বলতে অনেক সময় লাগবে। আমরা বরং এক্সপেরিমেন্টগুলো দেখি। তার আগে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু ধারণা দিই।

'অ্যাভালাঞ্চ, মিস্টার আরসালান। এই তুষারধস কয়েক হাজার ফুট ওপর থেকে নেমে আসে, বয়ে আনে কয়েক মিলিয়ন টন ওজনের সাদা একটা চাদর–এত বিপুল তুষার, একটা সেনাবাহিনী চাপা পড়ে যাবে, আর এই তুষারই

স্নোম্যান, অর্থাৎ রা.ত্রি.-কে দুর্ভেদ্য করে তুলেছে।

'কিন্তু তুষারধস ঘটে কেন? শুধু গ্র্যাভিটি দায়ী নয়, মাই ফ্রেন্ড। আপনাকে টেমপারেচার, শিশির থেকে তৈরি বরফ কণা, ওগুলোর গভীরতা, তুষার কণার আকার, তরল পানির মাত্রা, বাতাসের মতিগতি, তুষারের বাষ্পে পরিণত হওয়ার হার, প্রসারণ প্রবণতা, স্তরের গঠন প্রকৃতি ইত্যাদি আরও বহু কিছু বিবেচনা করতে হবে।

'এই ক্যাসকেইড পার্বত্য এলাকায় আমি শুধু এক হাজার হিট আর সাউন্ড সেনসর বসাইনি, এমন সেনসরও বসিয়েছি যেগুলোর কাজ হলো তুষারের যে-কোন পরিবর্তন রেকর্ড করা।'

কমপিউটারের একটা বোতাম টিপ দিল ক্যামপেরো। স্ক্রিনে ফুটে উঠল পাহাড়ী দৃশ্য। তুষারের একটা শেলফে স্থির হলো ক্যামেরা। তারপর সেটা ঘুরে গেল একটা হাউইটসার-এর দিকে। পঁচাত্তর মিলিমিটারের কামান ওটা। টার্গেট পাহাড়ের একটা দিক। সম্ভবত মাইলখানেক দূরে।

'কামানটা থেকে এক্সপ্লোসিভ শেল ছুটবে,' বলল ক্যামপেরো। 'তুষারের সাপোর্টিং লেয়ার ভাঙার জন্যে দরকার আসলে শক। তবে দুঃখের বিষয় হলো, আপনি নিজেই দেখতে পাবেন, এই লোকগুলোর জানা ছিল না শকটা কত জোরাল হওয়া উচিত।

'এই এক্সপেরিমেন্টটা বেশ অনেক আগে মার্কিন সরকার করেছে, ইউটয়। করা হয় দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে তুষারপাত হওয়ার পর–সেবার তুষারপাতের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ ইঞ্চি।'

হাউইটসার থেকে ফায়ার হলো। পাহাড়ে আঘাত লাগাটা দেখা গেল কি গেল না। তারপর, অতি দ্রুত, দৃশ্যটা বদলে যেতে শুরু করল। পাহাড়টা মনে হলো কাঁপছে। উঁচু চূড়া থেকে টন টন ধসে পড়ছে নীচের চূড়ায়, সংগ্রহ করছে আরও ওজন আর গতি। পাহাড়টার গোড়ায় সাদা একটা ঘের তৈরি হচ্ছে।

অকস্মাৎ ক্যামেরা ঝট্ করে ঘুরে গেল। পাশের পাহাড়ে আরেকটা তুষারধস শুরু হয়েছে। একই দৃশ্য দেখা গেল তৃতীয় পাহাড়েও। এ-সবই ঘটছে মাত্র একটা আর্টিলারি শেল থেকে। প্রথম তুষার ধস এখনও নামছে, ছুটে আসছে ক্যামেরার দিকে।

'এই ধসের গতি ঘণ্টায় একশো বিশ মাইল।'

ক্যামেরা আবার ঘুরল। এবার কামানের সরাসরি পিছনের পাহাড়ের দিকে। মিহি সাদা পাউডারে ঢাকা পড়ে গেছে চূড়া। লোকজন আর ক্যামেরার দিকে জলপ্রপাতের মত টন টন তুষার নেমে আসছে। ক্যামেরা পাগলামি শুরু করল, সন্দেহ নেই প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে ক্যামেরাম্যান। আরও বহু লোককে দৌড়াতে দেখা গেল। অনেকে ঝুঁকে স্কি-র স্ট্র্যাপ আটকাচ্ছে পায়ে।

দুটো ধাবমান স্রোত দু'দিক থেকে এসে এক হলো। ক্যামেরার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরের লোকজন প্রথমে চাপা পড়ল। ক্যামেরার পাগলামি চূড়ান্ত রূপ নিল, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল স্ক্রিন।

বোতামে চাপ দিল ক্যামপেরো। স্ক্রিনে আবার স্নোম্যানের মানচিত্র ফুটল।

'দুটো ভুল করেছে ওরা,' ব্যাখ্যা করল ক্যামপেরো। 'তুষার বিশ্লেষণ করেনি–জানত না কী ধরনের তুষার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে। জানলে বুঝতে পারত কতটা ভয়ঙ্কর তুষারধস নামছে।

'দ্বিতীয় ভুলটা হলো–ওরা কামান দাগে জমিন থেকে। ফল? ওদের কোন অস্তিত্ব নেই। আর আমরা কী করব? আমাদের কোবরায় এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড বা রকেট আছে। আমরা নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারব ঠিক কী পরিমাণ অ্যামিউনিশন দরকার হবে, কারণ কমপিউটার স্নোম্যানে আমার সবগুলো পথের তুষার সারাক্ষণ বিশ্লেষণ করছে।

'অনুপ্রবেশকারীরা গুলি খেয়ে মরবে, তুষার ধসে ডুবে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে। আমাদের কোবরা ফিরে আসবে অক্ষত। বুঝতেই পারছেন, মিস্টার আরসালান, আমাদের গোপন অস্ত্রটা হলো–তুষার।'

'হ্যাঁ, তা বুঝলাম,' বলল রানা। ওর জানা মতে বিসিআই-এর নির্দেশে রানা এজেন্সির শাখা প্রধানরা হয় মার্সেনারি, নয়তো নুমার সাহায্য নিয়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছাতে চেষ্টা করবে রা.ত্রি. বা স্নোম্যানে। 'আইডিয়াটা সত্যি ভাল।'

'এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। আমাদের অ্যাভালাঞ্চ সিস্টেম যে-কোন বাহিনী বা গ্রুপের হামলা ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীকে ঠেকাবার উপায় কী? মেহমান হয়ে আমাদের এখানে ঢুকে পড়লে? তাই স্পাইদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কমপিউটারকে দিয়ে একটা সিস্টেম তৈরি করিয়েছি।' ক্যামপেরোর ভুরু উঁচু হয়ে কপালে পৌঁছাল। 'এটা আপনার চিত্ত চাঞ্চল্য না ঘটিয়ে পারে না।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে ফুটো করা একটা কমপিউটার কার্ড বের করল সে।

'এই কার্ডে ফাহিম আরসালানের একটা পোর্ট্রেইট আছে। অর্থাৎ, আমার ডিরেক্ট অবজারভেশন আর নাদিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু জানা গেছে সব আছে এর মধ্যে। শারীরিক বৈশিষ্ট্য মাত্র একটা পর্যায় পর্যন্ত নোট করা হয়েছে, যাতে ছদ্মবেশ আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

'তবে আপনার শারীরিক গঠন, বিশেষ দক্ষতা, ভাষার ওপর দখল, রিফ্লেক্স, ড্রাইভিং স্কিল, বেফাঁস মন্তব্য, খুন–যা কিছু নিশ্চিতভাবে জানা গেছে তার সবই আছে এখানে।

'আমরা এখন আক্ষরিক অর্থেই দেখতে পাব ফাহিম আরসালান সত্যি অন্য কেউ কি না, তাকে আমাদের সর্বনাশ করার জন্যে পাঠানো হয়েছে কি না। আমার মেয়ে বিশ্বাস করতে চাইছে নিজেকে আপনি যা বলছেন, আসলেও আপনি তাই। আমি,' কার্ডটা দিয়ে জ্যাকেটের বোতামে টোকা দিল সে, 'একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখতে চাইছি। আমার বিশ্বাস, আপনাকে দেখে যা মনে হচ্ছে আপনি তাই–অসম্ভব যোগ্য একজন অপারেটর; এত বেশি যোগ্য যে তার অখ্যাত হবার কোন উপায় নেই। অথচ ফাহিম আরসালানের নাম না আমরা কেউ শুনেছি, না কোনও কমপিউটার মনে রেখেছে। ব্যাপারটা আসলে কী বলুন তো, মিস্টার আরসালান?'

ফুটো করা কার্ডটার দিকে তাকাল রানা। ওর পিঠের পেশি ভয়ে ক্রল শুরু

করেছে। তবে কাঁধ ঝাঁকাল স্মার্ট ভঙ্গিতে, মুখে গম্ভীর হাসি। 'আপনার কথাই ঠিক। আমি ইন্টারেস্টেড। দেখি কী দেখা যায়।'

কার্ডটা স্ক্যানারে দিল ক্যামপেরো। স্ক্রিন থেকে আবার অদৃশ্য হলো মানচিত্র। রানার দিক থেকে স্ক্রিনের দিকে ছুটে গেল নাদিয়ার দৃষ্টি। মেয়েটা হয়তো রানার প্রতি দুর্বল, তবে সে-ও একজন মাফিয়োসো, একজন সিসিলিয়ান। তারও প্রচণ্ড কৌতূহল জাগছে।

স্ক্রিন দু'ভাগ হয়ে গেল। উপর থেকে নীচে নেমে আসা রেখার পর রেখা সাজিয়ে স্ক্রিনের বাম দিকে রানার কাঠামো তৈরি করছে কমপিউটার–হুবহু রানারই শরীর, পাশে উল্লেখ থাকছে ওজন, উচ্চতা, বডি টাইপ, খুলির মাপ ইত্যাদি। তারপর জানা গেল–

কমব্যাট অ্যাবিলিটি, ভাষার উপর দক্ষতা, বিশেষ নৈপুণ্য, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি। ওর শরীর সম্পর্কে সবই বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

'এবার দেখা যাক এই কাঠামো আর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কেউ ম্যাচ করে কি না।' ক্যামপেরো একটা সিডি ভরল কমপিউটারে।

এবার স্ক্রিনের ডান দিকে ছায়ামূর্তি আর তথ্য আসতে শুরু করল।

'বুঝতেই পারছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকদের নিয়ে বিশেষ একটা মেমোরি ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি আমি। কারণ, নিশ্চয়ই আপনি তাদেরই একজন হবেন। ওই ব্যাঙ্ক ঢুঁ মেরে আমি খুঁজতে থাকলাম সেই সব লোকদের, যারা অসম্ভব মেধাবি, অসমসাহসী, বুদ্ধিতে যাদের ক্ষুরের ধার। যারা বিভিন্ন এজেন্সিতে কাজ করে, মাফিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার রেকর্ড আছে, মাফিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাওয়ার কারণ আছে।'

স্ক্রিনের ডান দিকে একটা ছায়ামূর্তি রয়ে গেল। ফাহিম আরসালানের সঙ্গে ম্যাচ করে, এমন একজনকে পাওয়া গেছে।

'আমি গর্বিত,' বলল ক্যামপেরো, তারপর ম্যাচ বা জোড়ার নামটা উচ্চারণ করল, 'মাসুদ রানা। এবার, মিস্টার রানা, মানবেন তো যে স্নোম্যানের প্রোটেকটিভ সিস্টেম স্বয়ংসম্পূর্ণ?'

তেরো

'বুঝলাম না,' বলল রানা, দেখল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজের পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল ক্যামপেরো। নাদিয়া ওর কাছ থেকে একটু সরে গেল–বাবাকে গুলি করবার সুযোগ দিয়ে, না কি প্রয়োজনের সময় বাধা দেওয়ার জন্য, বলা কঠিন।

'মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট। এক সময় নিজেকে আপনি মাফিয়ার যম বলে প্রমাণিত করেছিলেন। আপনার হাতে ইউনিয়ন কর্সও নাস্তানাবুদ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আপনার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে–সব মিলিয়ে কয়েক কোটি মার্কিন ডলার।

'এবার, অর্থাৎ নতুন করে মাফিয়ার বিরুদ্ধে আপনার খেপে ওঠার কারণ অনন্য রায়হান। আফগান আফিম কেনার অগ্রাধিকার কার, এই নিয়ে এশীয় মাফিয়া পরিবারগুলো নিজেদ্রের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল, মীমাংসার জন্যে আমি আমার এক প্রতিনিধিকে পাঠাই সেখানে।

'অনন্য রায়হান তার আগেই একটা থাই মাফিয়া দলে অনুপ্রবেশ করে, বাংলাদেশকে আদর্শ এবং নিরাপদ একটা ট্র্যানজিট পয়েন্ট হিসেবে তৈরি করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। যাই হোক, প্রস্তাবটা লুফে নেয় আমার প্রতিনিধি। থাই মাফিয়া দলের চিফ আর বাংলাদেশী অনন্য রায়হানকে রাত্রি অর্থাৎ স্নোম্যানে আসবার আমন্ত্রণ জানানো হয় ব্যবসার শর্ত আর কমিশন নিয়ে আলাপ করার জন্যে। প্রসঙ্গক্রমে ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি সম্পর্কে খানিকটা আভাসও দেয়া হয় অনন্যকে।

'এ-সবই করা হয় আমার অজ্ঞাতে। প্রতিনিধি রিপোর্ট করল অনেক পরে। সেই রিপোর্ট পড়ে আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলাম। কমপিউটারের গায়ে টোকা দিল সে। 'এর মেমোরি ঘাঁটতেই বেরিয়ে এল অনন্য রায়হানের আসল পরিচয়।

'ততদিনে ঘটনার আরও গভীরে পৌঁছানোর জন্যে অনন্য চলে গেছে ভারতে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেদিনীপুর জেলার দীঘায়। নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে আমার প্রতিনিধিও ছুটল তার পিছু নিয়ে। এরপরের ইতিহাস আপনি জানেন, মিস্টার রানা।'

'না, আমি জানি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। অনন্য রায়হান কে, আমি জানি। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি মাসুদ রানাও নই।'

'আপনার ফাইলে এই কথাটাও লেখা আছে–খুব কায়দা করে মিথ্যে কথা বলতে পারেন।'

'কিন্তু রানার সঙ্গে আমার যে অনেক ক্ষেত্রে মিল নেই, এটা তো মিথ্যে নয়। কমপিউটার বলছে ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা সে। কিন্তু আমি তো অত লম্বা নই।'

'রানাকে ভয় পায় মানুষ। এই ভয় থেকে আপনার শত্রুরা আপনাকে অতিরিক্ত তিন-চার ইঞ্চি দিয়ে ফেলেছে।'

'রানার কোন ছবি নেই আপনার কাছে?'

'সময়ের অভাবে ভাল ছবি যোগাড় করা যায়নি, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। অবিশ্বাস্য রিয়্যাকশন টাইম, ভাষার ওপর দখল, শারীরিক গঠন–সব মিলে যাচ্ছে। রানা ছাড়া এত দুঃসাহস কার হবে, একা বিশ্ব-মাফিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলে আসবে?'

নাদিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কিছু বলছ না কেন? তোমার ড্যাডি ভুল করছেন, তুমি সেটা শুধরে দাও।'

'তুমি কি–' ইতস্তত করছে নাদিয়া, সংশয়ে ভুগছে, 'তুমি কি সত্যি মাসুদ রানা নও?'

'না।'

'তা হলে তুমি অনন্যকে চিনলে কীভাবে? আমার গুরু ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি

সম্পর্কেও সব কথা জানো তুমি।'

'কী আশ্চর্য! অনন্য আমার এজেন্ট, আমি তাকে চিনব না তো কে চিনবে! বিসিআই-এ আমার নির্দেশেই ঢুকেছিল সে। থাই মাফিয়ার দলেও আমি তাকে অনুপ্রবেশ করতে বলেছিলাম। আর ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি সম্পর্কে জেনেছি নিজের গরজে—গোটা বিশ্বের মাফিয়া সাম্রাজ্যে নতুন একটা শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, একজন নতুন গড ফাদারের আবির্ভাব ঘটেছে, ব্যবসা করতে হলে আমাকে এ-সব জানতে হবে না? সে খবর নিতে গিয়েই জানতে পারলাম ভগবান রাত্রির কথা।'

নাদিয়াকে সন্দিহান দেখাল।

কামরার চারদিকে সশস্ত্র গার্ডের সংখ্যা বেড়ে ছ'জন হয়ে গেছে।

'সে তথ্যও এখানে আছে,' ইঙ্গিতে কমপিউটারটা দেখাল ক্যামপেরো। 'মাসুদ রানা গল্প বানাতে ওস্তাদ।'

'আপনার কমপিউটার ভুল করছে, আমি রানা নই, বোতাম টিপে আরসালানকে আনুন, সব ভুল ভেঙে যাবে আপনার।'

'দুনিয়াকে রানা-মুক্ত করার জন্যে,' বলল ক্যামপেরো, 'আমি আরসালানকে খুন করতে রাজি। তুমি একটা মরা মানুষ, ইয়াং ম্যান।'

'রানার সঙ্গে আমার যে মিলের কথা তোমার ড্যাডি বলছেন,' নাদিয়াকে বলল রানা, 'সেরকম মিল আরও অনেকের সঙ্গেই পাওয়া যাবে। বোতাম টিপে দেখতে বলো।'

'ড্যাডি? ওর কথায় যুক্তি আছে। বোতাম টিপে দেখো তুমি।' হাতব্যাগ খুলে পিস্তল বের করল সে, রানাকে সেটা দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি সত্যিই মাসুদ রানা হও, আমি নিজের হাতে তোমাকে খুন করব।'

মেয়ের হাতের পিস্তলটার দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে বার দুয়েক তাকাল ক্যামপেরো। 'ঠিক আছে। এতে কোন কাজ হবে না, তবু পুরো টেপটা আমি চালাচ্ছি।'

সচল হতে না হতে স্থির হয়ে গেল টেপ। স্ক্রিনের লেখাগুলো পড়ল নাদিয়া। 'ফার্গু মোরেন। হ্যাঙ্গেরিয়ান স্টেট সিকিউরিটি এজেন্ট। অ্যাসাসিন। শারীরিক মিল হুবহু। শেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তুরকি ভাষা জানে না।'

তৃতীয়বার সচল হলো টেপ। ত্রিশ সেকেন্ড পর আবার থামল। আরেকটা ম্যাচ পাওয়া গেছে।

'গুস্থার বয়লার, জার্মান সিক্রেট পুলিশ। ব্যক্তিত্ব ছাড়া বাকি সব কিছু মেলে। টেপ চালাও, ড্যাডি।' সচল হয়ে আবার থামল টেপ। 'লুদভিক লোরেস্কি, রাশিয়ান, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স।'

হাত বাড়িয়ে টেপটা বন্ধ করে দিল নাদিয়া। 'ড্যাডি, তোমার বোধহয় আরসালানকে একটা ব্যাখ্যা দেয়া দরকার, কিংবা দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।'

'কেন?'

'কারণ শুধু মাসুদ রানা নয়, আরও অনেকের সঙ্গে ওর বহু কিছু মিলে যাচ্ছে।' একটু থেমে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল নাদিয়া। 'শ্রদ্ধা করতে পারি, এমন

এই একজনের সঙ্গে বহু বছর পর আবার আমার দেখা হয়েছে, ড্যাডি। প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আমার গুরু, ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি। কিন্তু তাঁকে তুমি জোর করেই আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ, ব্যবহার করছ নিজের কাজে।

'সেই একই ঘটনা দ্বিতীয়বার আমি ঘটতে দেব না, ড্যাডি। আরসালানকে আমার চাই-ই। দুনিয়ার সমস্ত নারকোটিক ব্যবসা আমরা দু'জন নিয়ন্ত্রণ করব।' কমপিউটার থেকে সিডিটা বের করে নিয়ে কামরার আরেকদিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, ওকে নিজের হাতে মারব আমি। কিন্তু তা না হওয়া সত্ত্বেও ওকে যদি তুমি স্পর্শ করো, মনে রেখো, আমিও তোমাকে ছাড়ব না!'

রানার দিকে তাকাল ক্যামপেরো। তার চেহারায় পরাজয়ের কোন ছাপ নেই। ভাব দেখে বোঝা গেল, ধৈর্য ধরবে সে। 'ঠিক আছে, নাদিয়া। তোমার বন্ধু আপাতত বেঁচে গেল, যতক্ষণ তুমি ওর মৃত্যু না চাইবে আর কী।'

রানাকে পথ দেখাল নাদিয়া। পিছনে থাকল দু'জন সশস্ত্র গার্ড। সাদা একটা টানেল ধরে এগোল ওরা, কার্পেটে মোড়া মেঝে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। টিউব লাইট জ্বলছে। বার কয়েক বাঁক নেওয়ার পর একটা লোহার গেট দেখা গেল। তালা খুলে ইঙ্গিতে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখাল নাদিয়া।

সিঁড়ির গোটা পঞ্চাশ ধাপ বেয়ে বিশাল একটা কাঁচের ঘরে বেরিয়ে এল ওরা। ঘরটার সব কিছু সাদা। প্রথমে রানা বুঝতেই পারেনি যে এটা একটা ঘর, ভাবল বাড়ির বাইরে তুষারের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ভুলটা ভাঙল একটু পরেই।

এখানে ঠাণ্ডা লাগছে না। দেয়ালের গায়ে এয়ার ডাক্ট রয়েছে, গরম বাতাস ঢুকছে ওগুলো দিয়ে।

ঘরটার মাঝখানে শ্বেতপাথরের একটা উঁচু বেদি দেখা যাচ্ছে। সেই বেদির উপর চোখ বুজে বসে আছেন সন্ন্যাসী। রানা ভাবল, ইনিই তা হলে ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি!

সন্ন্যাসীর বয়স হয়েছে, সত্তরের কাছাকাছি। প্রশান্ত, সৌম্য মূর্তি থেকে যেন একটা স্বর্গীয় আভা বেরুচ্ছে।

'এই ঘরটা ড্যাডিই তৈরি করে দিয়েছেন। লোকজন নেই, কোলাহল নেই, চারদিকের সাদা তুষারে এমন কিছু নেই যা কারও কৌতূহল জাগাতে পারে–ধ্যান করার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।'

'তুমি এমন সময় নিয়ে এলে আমাকে, ওঁর সঙ্গে আমি কোন কথা বলতে পারব না।'

'তুমি আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাও না? তা জানতে হলে গুরুজিকে ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই পেতে হবে।'

'উনি কী সবার সব প্রশ্নের উত্তর দেন?'

মাথা নাড়ল নাদিয়া। 'অনেক সময় কয়েকবার জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যায়। আবার এমনও হয় যে, একটা প্রশ্নের উত্তর দিলেনই না। আসলে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। কী জানতে চাও বলো, আরসালান।'

'ও-সব পরে। তার আগে আমার কৌতূহলটা মেটাতে পারো কি না দেখো।'
'কৌতূহল?'
'তখন তুমি মিস্টার ক্যামপেরোকে বললে, গুরুকে উনি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। এর মানে কী?'
'গুরু আমার আবিষ্কার,' বলল নাদিয়া। 'আমি চেয়েছিলাম দুনিয়ার মানুষ তাঁর সম্পর্কে জানবে। অনেক মানুষ উপকার পাবে। কিন্তু ড্যাডি তাঁকে দিয়ে একা শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধার করছে।'
'এখানেই আমার কৌতূহল। তোমার ড্যাডি কীভাবে কাজে লাগাচ্ছেন তাঁকে?'
'সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আরসালান। সত্যি কথা বলতে কি, ড্যাডি তো নগণ্য একজন অপারেটর ছিল। হিট ম্যান হিসেবেও কয়েক বছর কাজ করেছে।' বাপকে পেশাদার খুনী বলছে নাদিয়া। 'কামাই মন্দ হত না, তবে তাতে ধনী হবার স্বপ্ন দেখা চলে না। তারপর একটা কেসে ফেঁসে গেল। না বুঝে খুন করে বসল এক মাফিয়া বসের ছেলেকে।
'আমাকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় পালাল ড্যাডি। ওখানে আমরা গুরুকে আবিষ্কার করলাম। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ড্যাডির মাথায় এক গাদা আইডিয়া খেলল।
'যার ছেলেকে খুন করেছে, সেই মাফিয়া বসের ভবিষ্যৎ জেনে নিয়ে ই-মেইল করল ড্যাডি তাকে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে কী কী ঘটতে যাচ্ছে, সব জানিয়ে দিল তাকে। ভবিষ্যৎ জানতে পেরে সতর্ক হয়ে গেল বস। ব্যবসায় তার লাভ হলো লক্ষ-লক্ষ ডলার। বন্ধুকে শত্রু বলে চিনতে পারল সে, বেশ ক'টা বিপদ এড়িয়ে যেতে পারল অনায়াসে। ড্যাডিকে ক্ষমা করে দিল লোকটা।
'এটা মাত্র একটা উদাহরণ, প্রায় একইরকম ঘটনা আরও শত শত ঘটেছে। কোন ব্যবসায় লাভ হবে কি না, কোন বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে কি না—এ-সব আগে থেকে জানতে পারলে যে-কোন মানুষের জীবনে তো বিপ্লব ঘটে যাবে। ড্যাডির জীবনে তাই ঘটেছে।
'সারা দুনিয়ায় শুধু ড্যাডির প্রতি অনুগত মাফিয়া চিফরা বেঁচে আছে। বাকি সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, কারণ গুরু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা বেঁচে থাকলে ড্যাডি মারা যেত।'
'ভাবছি এ-সব আমার কতটুকু বিশ্বাস করা উচিত,' বলল রানা, চিন্তিত। 'এরকম কি সত্যি কেউ পারে? অচেনা একজন মানুষ সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা, এ তো শুধু অলৌকিক নয়, রীতিমত ঐশ্বরিক ক্ষমতা।'
'কী ক্ষমতা, তার বিচার-বিশ্লেষণ বিজ্ঞানীরা করবেন, অন্তত আমি তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হয়নি, বোধহয় হবার নয়ও। তবে গুরুর কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়, আমি তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। একবার নয়, তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি।'
'যেমন? দু'একটার কথা শোনাও।'
'ডমিনিক ডানকানের নাম তো শুনেছই—লাভার বয়। ওয়েস্ট কোস্টের

একজন কাপ্তান। পরিচয় হবার পর গুরুকে জিজ্ঞেস করলাম, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন হবে। গুরু জানালেন—"ডানকান তোকে ক্যানথ্যারিডিন, অর্থাৎ স্প্যানিশ ফ্লাই দেবে। তাতে তুই মারা যেতে পারিস।" সত্যি তাই দিল ডানকান।'

'কিন্তু তা হলে কী আমার সামনে তুমি ভূত বসে আছ?'

'আমি মরিনি, গুরুর কথা শুনে সাবধান হই, তাই,' বলল নাদিয়া। 'ডানকান ঠিকই আমাকে গোপনে স্প্যানিশ ফ্লাই খাওয়াতে চেয়েছিল। বুদ্ধি করে আমি সেটা না খেয়ে তাকেই খাইয়ে দিই।'

শিউরে উঠতে যাচ্ছিল রানা, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। পরমুহূর্তে ওর কালঘাম ছুটিয়ে দিল নাদিয়া।

'আচ্ছা! ড্যাডির কথা সত্যি, না কি তোমার কথা, গুরুজিকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারি আমি!'

'তারমানে আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?'

ঘাড় ফিরিয়ে গার্ড দু'জনের দিকে একবার তাকাল নাদিয়া। তারপর ধ্যানে মগ্ন ভগবান রাজীব ত্রিপাঠির দিকে এগোল। 'ভুলে যেয়ো না, আরসালান, এখানে তুমি একটা ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ। অর্থাৎ ড্যাডির সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা তোমার প্রথম কাজ। আমি সেই কাজে তোমাকে সাহায্য করছি।'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল গার্ড দু'জন দু'দিকে সরে যাচ্ছে, যাতে তাদের লাইন অভ ফায়ারে সাধু রাজীব ত্রিপাঠি বা নাদিয়া চলে না আসে।

বেদির সামনে কষ্টিপাথরের তৈরি একটা কৃষ্ণমূর্তি রয়েছে। সেটার পাশে করজোড়ে দাঁড়াল নাদিয়া। 'জয় হোক গুরুজির! ভগবান রাত্রির জয় হোক! প্রণাম হই, বাবা!' একটু বিরতি, সন্ন্যাসী কিছু বলেন কিনা কান পেতে শুনবার অপেক্ষায় থাকা, তারপর পুনরাবৃত্তি।

তিনবারের বার সন্ন্যাসীর ঠোঁট জোড়া একটু নড়ল। 'কী চাও বলো, বেটি।'

দম বন্ধ করল রানা।

'আমার সঙ্গে এ কে, গুরুজি? কাকে আমি বাড়িতে নিয়ে এসেছি?' জানতে চাইল নাদিয়া। আবেগে হোক বা আশঙ্কায়, তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'আমাদের মনে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তা কেবল আপনিই দূর করতে পারেন।'

'ওরে পাগলী, ওকে তোরা চিনবি কীভাবে!' সাধু জবাব দিলেন। চোখ বন্ধ, অথচ ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা। 'ও তো বহুরূপী!'

'গুরুজি, আপনার এই জবাবে আমি খুশি হতে পারছি না। দয়া করে আরও স্পষ্ট করে বলুন। ও কি মাসুদ রানা, না ফাহিম আরসালান?'

'ও মাসুদ রানা!' ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি শেষ পর্যন্ত বোমাটা ফাটিয়েই দিলেন। অবশ্য সেই বোমা অকেজো করতেও বেশি সময় নিলেন না তিনি। 'আবার ও ফাহিম আরসালানও বটে। বহুরূপী বলেই যখন যে রূপ নেয়, তখন ও তাই। আমাকে ভেতরের মানুষটার কথা জিজ্ঞেস করো, আরও স্পষ্ট জবাব পাবে।'

'ওর হাতে কি আমার মৃত্যু আছে?'

'না।'
'আমার হাতে মারা যাবে ও?'
'না।'
'ড্যাডি কি ওকে খুন করবে?'
'না।'
'ও কি ড্যাডিকে খুন করবে?'
'না।'
একটু বিরতি, নাদিয়া যেন দম নিচ্ছে। 'ও কি আমাকে ভালবাসে?'
'কঠিন প্রশ্ন। তবে মানুষকে ভালবাসে ও, আর দেশকে।'
'গুরুজি, এটা খুব জরুরি প্রশ্ন! ও কি আমাকে ভালবাসে?'
'ও তোমাকে ঘৃণা করে না।'
'বুঝেছি! আমাদের দু'জনের ভবিষ্যৎ কী?'
'তোমরাই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ। তবে কয়েকটা যদি আছে?'
'যদি?'
'যদি ওকে তুমি বাঁধতে পারো। যদি বন্ধনটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। মিলনের পথে বাধাগুলো যদি এড়াতে পারো। যদি অতি আপনজনের বিশ্বাসঘাতকতা সফল না হয়।'
'আপনি বলতে পারছেন না, আমরা সার্থক হব কিনা?'
'অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। বললে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া হয়। তবে তোমাদের খুব বিপদ।'
'কী বিপদ, গুরুজি?'
সন্ন্যাসী আর কোন প্রশ্নের জবাব দিলেন না। রানার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল; নাদিয়া বলল তার গুরুজি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর কোন প্রশ্নের জবাব দেবেন না।

চোদ্দ

পরদিন সকাল থেকে শুরু হলো। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মাফিয়া চিফদের আগমন। প্রায় সারাটা দিন ধরে প্যাডে ব্লু ডাক হেলিকপ্টারগুলোকে ল্যান্ড করতে দেখা গেল।
মাফিয়োসোরা অ্যাটাশে কেসের চেয়ে বড় কিছু বহন করছে না, নিরাপত্তার দিক চিন্তা করে আগেই তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।
সব মিলিয়ে চল্লিশজন পরিবারপ্রধান উপস্থিত হলো। প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে উপদেষ্টা আছে। ক্যামপেরোর প্রাসাদটা এত বড়, প্রত্যেকের জন্য একটা করে স্যুইট বরাদ্দ করবার পরও অর্ধেকের বেশি খালি পড়ে থাকল।
বেশির ভাগ চিফ ছুটির রোমাঞ্চ অনুভব করছে। স্টেডিয়াম তুল্য লিভিংরুমে

যৌন সুড়সুড়ি উদ্রেক করবার মত কৌতুক আর স্কচ হুইস্কির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ঘানার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে পিঠ চাপড়ানোর একটা প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, আত্মরক্ষার জন্য অন্য একটা গ্রুপের সঙ্গে স্কি করল রানা, তারপর ফিরে এসে সুইমিংপুলে ঘণ্টাখানেক সাঁতরাল। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীদের মাঝখানে নিজেকে কিছুটা অসহায় বলে মনে হলেও, ভাবটা গোপন রাখতে রানার তেমন অসুবিধে হলো না।

মাফিয়োসোদের পরিত্রাতা ক্যামপেরো নিজের সন্দেহ গোপন করে রেখেছে, তা না রাখলে নাদিয়ার কী প্রতিক্রিয়া হবে জানে সে।

ক্যামপেরোর ক্ষমতা আর প্রভাবের কারণটা আরও স্পষ্ট হলো ডিনারের সময়।

'মিস্টার ক্যামপেরোকে,' রানার ডানে বসা চিফ বলল, 'সমস্ত মাফিয়া ফ্যামিলির অভিভাবক বলতে পারেন আপনি। উনি আমাদের কীভাবে সাহায্য করেন বলি। আমাদের নাম্বারড্ অ্যাকাউন্টের নাম প্রকাশ করার জন্যে সুইস সরকারকে চাপ দিচ্ছে এফবিআই, তারাও নতি স্বীকার করতে যাচ্ছে। সবাই আমরা বুঝি, এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। সারাজীবন প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে কামানো দুটো পয়সা সরিয়ে রেখেছি, সেটাও কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র হবে!'

'খারাপ কথা,' সহানুভূতি জানাল রানা।

'কাজেই আমরা মিস্টার ক্যামপেরোর শরণাপন্ন হলাম। মিস্টার ক্যামপেরো কী করলেন? তিনি আমাদের টাকা নিয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলেন–সেগুলো এমন কোম্পানি, একটাও লোকসান দেবে না। কী ভাবে যেন উনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। লুক্সেমবার্গ আর সুইটজারল্যান্ডে মিস্টার ক্যামপেরো ব্যাঙ্কও খুলেছেন। জাহান্নামে যাক শালার ওই সব নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট!'

ডিনারের পর চিফদের কাছ থেকে রানাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল নাদিয়া। 'ড্যাডি মাঝে-মধ্যে এমন কাণ্ড করে না!' খুবই বিরক্ত মনে হলো তাকে।

'কেন, কী করলেন তিনি?'

'চিফদের খুশি করবার জন্যে হলিউড থেকে পঞ্চাশটা মেয়ে আনিয়েছে। ধ্যাত!'

'শুধু কী এই একটা কারণে নার্ভাস হয়ে আছ তুমি?'

'না।'

'নিলাম?'

'নিলাম নিয়ে ড্যাডি মাথা ঘামাচ্ছে। আমার উদ্বেগ আরও বড়। তুমি আমাদের, না কি আমাদের নও?' মুখ বাড়িয়ে একটা চুমো খেল সে। কিন্তু রানা আলিঙ্গনে বাঁধতে যাচ্ছে দেখে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। 'না, প্লিজ। আরেকটু অপেক্ষা করো। কাল সন্ধে নাগাদ সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল রানা।

'একটা হিসাব করছিলাম।' রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল নাদিয়া। 'নিলামে

যে-ই জিতুক, ড্যাডি বলেছে তার কমিশনটা আমি পাব। এরপর আছে ডিসট্রিবিউটরের কাছ থেকে বাৎসরিক চাঁদা। আগামী ডিসেম্বর থেকে ড্যাডির সমস্ত আয়ের অর্ধেক আমার অ্যাকাউন্টে জমা হবে। সব মিলিয়ে, রক্ষণশীল হিসেবেও, বছরে তিনশো মিলিয়ন ডলার।'

'মন্দ নয়!'

'তোমার তুলনায় এ তো কিছুই না!' হাসল নাদিয়া। 'সে হিসেবও আমি করেছি। আমার চেয়ে ছয়গুণ বেশি হবে তোমার আয়। আবার, আমাদের দু'জনের আয় যদি কোথাও বিনিয়োগ করি, পাঁচ বছরে চারগুণ বেড়ে যাবে। গুরুজি তা হলে তো ঠিকই বলেছেন, আমাদের মত টাকা আর কেউ কামাতে পারবে না।'

নাদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের স্যুইটে ফিরে এল রানা, জানে ওর সিগন্যাল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে বিসিআই।

বাথরুমে ঢুকে দেখল যেভাবে রেখেছিল সেভাবেই রয়েছে রেজারটা। প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলল, হাতের তালুতে বেরিয়ে এল ছোট্ট ট্র্যান্সমিটার।

ইতোমধ্যে এএনএস এবং বিসিআই নিশ্চয়ই স্নোম্যানের নির্ভুল পজিশন জেনে ফেলেছে। স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় তোলা ফটোগুলো রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটন শাখার ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করা হবে। নখ দিয়ে টোকা মেরে কোডেড মেসেজ পাঠাল রানা: এয়ার অ্যাট ফাইভ হানড্রেড। পুরো এক মিনিট ধরে বারবার একই মেসেজ পাঠাল ও।

হাতঘড়ি দেখল রানা। রাত দশটা। ওর সন্দেহ আছে এএনএস-এর সশস্ত্র সদস্য আর রানা এজেন্সির এজেন্টরা যখন হেলিকপ্টার নিয়ে ক্যামপেরোর বাড়ির ছাদে নামবে তখন আকাশে বা প্যাডে কোন কোবরা অক্ষত থাকবে কি না। তবে ছাদে হেভি একটা মেশিনগান আছে, ওটার ব্যবস্থা ওকেই করতে হবে।

স্যুইট থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে লিভিংরুমের দিকে হাঁটছে ও। শুধু লিভিংরুমের সামনে দু'জন গার্ডকে দেখতে পেল রানা।

ভিতরটা খালি পড়ে আছে, কারণ চিফরা যে যার সঙ্গিনী বেছে নিয়ে বেডরুমে চলে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বডিগার্ডদের সঙ্গে ক্যামপেরোকে দেখতে পেল। একটা ল্যান্ডিং প্যাডে দৈত্যাকার চিনুক হেলিকপ্টার রয়েছে, ক্রুরা ফুয়েল ভরছে ট্যাংকে। এই কপ্টারে চড়েই এসেছে, কাল সকালে এটায় চড়েই ফিরে যাবে মেয়েগুলো। রানা কামনা করল, ওরা যেন ভোর পাঁচটার আগে চলে যায়।

স্যুইটে ফিরবার পথে করিডর থেকে একটা ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। আগেই দেখে গেছে এদিকটায় কোন গার্ড নেই।

ঝুল-বারান্দার রেইলিঙের উপর দাঁড়িয়ে পানির পাইপের নাগাল পেতে কোন সমস্যা হল না। ভেন্টিলেটর, এয়ার ডাক্ট ইত্যাদির গর্তে হাত আর পা আটকবার সুযোগও আছে। মাথাটা নাক পর্যন্ত তুলে ছাদে তাকাল রানা।

ছাদের মেশিনগানটা পয়েন্ট ফাইভ-ওয়ান ক্যালিবারের। এটা অ্যান্টি-

এয়ারক্রাফট শ্রেণীর গান, যে-কোন কপ্টারকে স্রেফ কেটে দুই টুকরো করে ফেলবে। বুদ্‌বুদ্‌টা দেড় ইঞ্চি পুরু প্লাস্টিক, এত মজবুত যে রকেট ছাড়া আর সব কিছুকে ফিরিয়ে দেবে।

টারিট রোলারগুলোকে আড়াল দিচ্ছে ইস্পাত। বিশেষ ধরনের একটা ভেন্ট দেখে রানা বুঝল বুদ্‌বুদের ভিতর গানারের জন্য রয়েছে প্রাইভেট এয়ার সিস্টেম, বাড়ির ভিতর কোন রকম গ্যাস ছোঁড়া হলে সে যাতে আক্রান্ত না হয়। তা ছাড়াও, শত্রুপক্ষের কপ্টার থেকে বিশেষ ভেন্টে টিয়ার গ্যাস ফেলা হলে, ওটা সে বন্ধ করে দিতে পারবে। তারপরও বুদ্‌বুদের ভিতর যথেষ্ট অক্সিজেন থাকবে, অন্তত আরও ঘণ্টাখানেক ফায়ারিং চালিয়ে যেতে তার কোন অসুবিধা হবে না।

বুদ্‌বুদের ভিতর আলো জ্বলছে। একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে গানার। হঠাৎ সেটা রেখে দিল সে। গুঞ্জন তুলল টারিট, গানারের পায়ের চাপে ঘুরে গেল। তার জোড়া মেশিনগানও ঘুরে গেল।

চিনুকের কাছাকাছি প্যাডে একটা ব্লু ডাক কপ্টার ল্যান্ড করছে। দেরি করে আসা নতুন আগন্তুক যেই হোক, গার্ডদের মনোযোগ এখন সেদিকেই নিবদ্ধ। পকেটনাইফের ফলা দিয়ে ভেন্ট কাভারের স্ক্রুগুলো খুলল রানা। এখন যদি টারিট এদিকে ঘোরে, খুন হয়ে যাবে ও। ছাদের লেভেল থেকে মাথা আর হাত যথেষ্ট দ্রুত গতিতে নামিয়ে নিতে পারবে না।

সর্বশেষ ঝড়ের কিছু তুষার ছাদে রয়ে গেছে। এক মুঠো তুলে নিয়ে রুমালটা ভিজাল রানা। তারপর ভেজা কাপড়ে এক টুকরো হেরোইন ক্যান্ডি চেপে ধরে ঘষতে লাগল, যতক্ষণ না নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

রুমালটা এয়ার ইনটেক-এর উপর, গ্রিলে বিছাল রানা।

টারিট স্থির হয়ে আছে, সদ্য আসা ব্লু ডাকের দিকে তাক করা। কভার লাগিয়ে স্ক্রু এঁটে দিল রানা, এলেমেলো তুষার হাত দিয়ে সমান করল। টারিট থেকে যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে এল। জোড়া ব্যারেল ওর দিকে তাক করল গানার। তবে ইতোমধ্যে ছাদের লেভেল থেকে হাত আর মাথা নামিয়ে নিয়েছে রানা।

এখনও মেশিন গানার বাতাস পাবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে খুব সামান্য মাদকই ঢুকবে তার ফুসফুসে। তবে এই সেমি-হেরোইনে কোন ভেজাল নেই। কেটে ভাগ করে দিলে এইটুকুই কয়েকশো নেশাখোরকে পাঠিয়ে দেবে অন্য জগতে। এ-ও সত্যি যে গানার লোকটা কয়েক ঘণ্টা ধরে শ্বাস গ্রহণ করবে। ভোরে যখন রানা এজেন্সির কপ্টারগুলো এদিকের আকাশে পৌঁছাবে, চোখ মেলে তাকাবার ক্ষমতাও থাকবে না তার।

ঝুল-বারান্দায় নামল রানা, তারপর করিডর হয়ে চলে এল লিভিংরুমে। নতুন আগন্তুক যারাই হোক, তাদেরকে স্যুইটে তুলে দিতে গেছে ক্যামপেরো নিজে। একা নাদিয়া ছাড়া খালি পড়ে আছে লিভিংরুম। ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি একটা সোফায় বসে আছে সে। ভাব দেখে মনে হলো রানার জন্য অপেক্ষা করছে।

'হাঁটছ, আরসালান? নিশ্চয় ঠাণ্ডায় জমে গেছ। একটু ব্র্যান্ডি নাও।'

'ধন্যবাদ।' বাড়ির বাইরে, ঠাণ্ডায় ছিল ও—এ-কথা নাদিয়া যেভাবেই জেনে থাকুক, রানা কোন প্রশ্ন করল না। গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে বাড়িয়ে ধরল নাদিয়া।

গ্লাসটা নিয়ে বলল, 'তুমি বোধহয় ঘুমাতে পারছ না।'

'না। নার্ভের ওপর খুব চাপ অনুভব করছি। তোমার কখনও এরকম হয়েছে, আরসালান? তোমার কাছ থেকে সব কেড়ে নেয়া হতে চলেছে, এমন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছ কখনও?'

'তুমি বোধহয় একটু বেশি ব্র্যান্ডি খেয়ে ফেলেছ, নাদিয়া।'

'ড্যাডি তোমাকে পছন্দ করছে না, আরসালান।'

'তোমার ড্যাডি হারতে পছন্দ করেন না। তাঁকে বোঝাও যে তিনি এমন একজন পার্টনার পেতে যাচ্ছেন যে সেই হাঁসটার মত সোনার ডিম পাড়ে।'

'কাউকে অপছন্দ হলে ড্যাডি তাকে খুন করে।'

আলাপটা একঘেয়ে হয়ে উঠল। অদ্ভুত এক হতাশায় ডুবে আছে নাদিয়া। সে হয়তো বুঝতে পেরেছে রানা নিজের সম্পর্কে সত্যি কথা বলেনি, এখনও বলছে না। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেস্ট-কোয়ার্টারের দিকে ফিরছে রানা।

গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আছে। হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে এগারোটা। মন্দ লোকেরা এত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায় না। তবে ব্যাপারটা নিয়ে রানা বিশেষ মাথা ঘামাল না। ওর নিজের চোখে ঘুম আসছে। পাঁচটার আগে তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে চায় ও।

স্যুইটে ঢুকে আলো জ্বালল। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

স্নোম্যানে উপস্থিত সব কজন মাফিয়োসো ওর জন্য অপেক্ষা করছে সিটিংরুমে। তাদের মাঝখানে রয়েছে ক্যামপেরো। ক্যামপেরোর পাশে নতুন অতিথিরা–আলবার্ট ডি' মোনা কার্টিস আর একজন জাপানি কুস্তিগির।

জাপানি কুস্তিগির ছয় ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, ওজন হবে তিনশো চল্লিশ পাউন্ড। তার ঘাড় স্বাস্থ্যবান একজন পুরুষের উরুর মত মোটা। মাথাটা কামানো। মুখে অসংখ্য শুকনো ক্ষতচিহ্ন। এই লোক নাগালের মধ্যে দাঁড়ানো কোনও মাফিয়া ডনের হাত ছিঁড়ে নিয়ে খেতে শুরু করলে রানা আশ্চর্য হবে না।

'আসুন, মিস্টার আরসালান, আসুন!' ভরাট গলায় স্বাগত জানাল ক্যামপেরো। 'প্রথমে নতুন মেহমানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ডি' মোনা–ওকে তো আপনি চেনেনই। আর ইনি হলেন মিস্টার তাকানাকা–গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী কুস্তিগির।'

তাকানাকা হাতির শুঁড়ের মত হাতটা বাড়িয়ে দিল। রানা সেটাকে দেখতে না পাওয়ার ভান করল। এরপর কী শুরু হবে আন্দাজ করতে পারছে, তার আগেই আহত হতে চায় না। 'কী ব্যাপার বলুন তো, মিস্টার ক্যামপেরো? সবাইকে নিয়ে এখানে কী করছেন আপনি?'

ইঙ্গিতে ডি' মোনাকে দেখাল ক্যামপেরো। 'ও একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছে।'

'কী খবর?' রানার গলা শুকিয়ে কাঠ।

'আপনি আসলেই বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা।'

রানা মুখ খুলতে গিয়ে বাধা পেল।

'একদম চুপ থাকুন। আপনি মাসুদ রানা এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।

হয়তো ভাবছেন তা হলে এখনও আপনাকে আমি গুলি করিনি কেন। না করার কারণ আছে।

'আমরা আরও খবর নিয়ে জেনেছি মাসুদ রানা সামান্য কোন ব্যাপার নয়। তিনি যদি কোথাও যান, সব কিছু তছনছ করে দিয়ে আসেন। অর্থাৎ এত কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে আপনি শুধু শুধু ঢোকেননি। আপনার অসৎ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

'সেটা কী, জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনাকে ইন্টারোগেট করা হবে। তবে ইন্টারোগেশনের আগে, ডি' মোনার পরামর্শ মত, একটু নরম করে নেয়া হবে আপনাকে। সেই নরম করার দাওয়াই সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে ডি' মোনা। দাওয়াইটার নাম, বলাই বাহুল্য, তাকানাকা। আর সব ডনও দেখতে চান, ওর বিরুদ্ধে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা।'

কোন সময়ই দেওয়া হলো না রানাকে, ক্যামপেরোর ইঙ্গিতে একজন গার্ড এম-সিক্সটিন চেপে ধরল ওর পিঠে। মিছিল করে ওকে নিয়ে আসা হলো বিলিয়ার্ডরুমে।

তাকানাকা টেবিলগুলো অনায়াস ভঙ্গিতে এক পাশে সরিয়ে দিল। রানাকে কাজটা করতে হলে ব্লক আর ট্যাকল ছাড়া পারত না।

হাতঘড়ি খুলবার সময় ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। সাড়ে বারোটা বাজে। কোনও সন্দেহ নেই, রানা এজেন্সির এজেন্টরা পৌঁছাবার আগেই জ্ঞান হারাবে ও।

দু'জনেই ওরা জুতো আর শার্ট খুলল, তারপর গুটিয়ে নিল ট্রাউজারের পায়া। রানার শরীরে যতই পেশি থাকুক, তাকানাকার সামনে হাস্যকর এবং অতি ক্ষুদ্র লাগছে ওকে। জাপানি লোকটা যেন রূপকথার বই থেকে বেরিয়ে আসা দৈত্য।

যাই হোক, ভাবল রানা—ওর চেয়ে আমার রিফ্লেক্স আর গতি হয়তো ভাল। ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিয়ে শূন্যে কয়েকটা ডিগবাজি খেল তাকানাকা। মেঝেতে হাত দিয়ে পড়ল, হাত দুটোকে পায়ের মত ব্যবহার করে দ্রুত হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ, রানার দিকে এগিয়ে আসবার ভঙ্গি করে ভয় দেখাল। তারপর আরেক লাফে সিধে হলো। এতটুকু হাঁপায়নি সে।

হাততালি দিল ক্যামপেরো। দেখাদেখি বাকি সবাই।

কোত্থেকে রান্না করবার দুই ক্যান তেল নিয়ে এসে রানা আর তাকানাকার মাথায় ঢেলে দিল ক্যামপেরোর এক লোক। কাঁধ, পিঠ আর বুকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, রানা শুনতে পেল কে জিতবে তা নিয়ে বাজি ধরবার ধুম পড়ে গেছে মাফিয়া ডনদের মধ্যে। ওর পক্ষে যারা বাজি ধরছে তারা এক ডলারের বিপরীতে একশো ডলার পাবে। দেখা গেল প্রায় কেউই ওর পক্ষে বাজি ধরছে না।

'ফ্রিস্টাইল কমব্যাট,' ঘোষণা করল ক্যামপেরো। 'কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয়। যে যেভাবে পারে। শুরু!'

তাকানাকা আর রানা পরস্পরের দিকে এগোল। দুটো শরীরই তেলে চকচক করছে। তাকানাকার বুকের ভারী পেশি তামা রঙের বেলুনের মত ফুলে উঠল। নতুন বুলেটের মত চকচক করছে তার খুলি।

দু'জন পরস্পরের পথ পার হলো, আলিঙ্গন করল, চাপড় মারল একে অন্যের উরুতে। ঐতিহ্য ধরে শুরুটা দেখে মনে হলো একটা ফ্রেন্ডলি টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ওরা। আসলে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, গোপন অস্ত্রের সন্ধানে তল্লাশী।

'ওরা জানে কে কী করছে,' বলল বোস্টন চিফ।

ক্যামপেরো ইটালিয়ান ভাষায় জবাব দিল, শুনে হেসে উঠল সবাই। অনুবাদ করলে, সে বলেছে, 'শুয়োরটা চিৎ হয়েছে।' শুধু জবাই করবার সময় একটা শুয়োরকে চিৎ করে শোয়ানো হয়।

কুঁজো হয়ে, হাত সামনে বাড়ানো, এগিয়ে এসে পরস্পরকে ধরল ওরা। দু'জনের মাথা আর কাঁধ এক হলো।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাস করে রানার গালে চড় কষল তাকানাকা, নখ দিয়ে চিরে দিল কপালের চামড়া, পরমুহূর্তে শরীরটাকে মেঝেতে পিছলে দিয়ে পা দুটোকে সাঁড়াশি বানাল, রানার গোড়ালি আটকে নিয়ে টান দেবে।

লাফ দিয়ে পা-টা সরিয়ে নিল রানা, পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকানাকার কিডনিতে হাঁটু গাড়ল।

সিধে হওয়ার সময় কোমরের বেল্ট ধরে রানাকে উঁচু করল তাকানাকা, তারপর মেঝেতে আছাড় মারল ভারী বস্তার মত। হাতের কিনারা দিয়ে রানার গলায় মারল সে, তবে রানা সরে যাওয়ায় লাগাতে পারল না।

সিধে হলো দু'জন। কাজটা এখনও শেষ করতে না পারায় তাকানাকা একটু বিস্মিত। আর রানা ভাবছে, আনআর্মড কমব্যাটে এত শক্ত প্রতিযোগী আগে কখনও পায়নি ও।

হাতির শুঁড়ের মত লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে আবার এগোল তাকানাকা। এবার পরস্পরকে ধরতেই তার কামানো মাথা কামানের গোলার মত সামনে ছুটল। রানার হাত দুটো আটকে রেখে মাথাটাকে হাতুড়ি বানিয়ে বারবার আঘাত করছে সে রানার মাথায়। খুলিটা তার আর্মার প্লেটের মত পুরু। আঘাতগুলো এড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু প্রতিবার নতুন নতুন ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে, চোখে রক্ত গড়িয়ে পড়ে অন্ধ করে দিচ্ছে ওকে।

তাকানাকার মাথা রানার লালচে দৃষ্টিপথে কংক্রিট ব্লক-এর মত ছুটে আসছে। তার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিছু হটল রানা, তারপর তলপেটে কষে একটা লাথি ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়াল। শূন্যে উঠে পড়েছিল তাকানাকা, অ্যাক্রোব্যাটের মত মেঝেতে পা দিয়ে নামল, হাসছে, অপেক্ষা করছে দু'এক সেকেন্ড।

টেবিল থেকে তাকানাকার শার্টটা তুলে নিয়ে মুখ আর কপালের রক্ত মুছল রানা। লোকটার মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল। ধেয়ে এল সে।

দুই পা সামনে এগিয়ে শূন্যে উঠল রানা। উড়ে এসে পা দুটো ল্যান্ড করল তাকানাকার মুখে। বিস্ফোরিত হলো জাপানি নাক, হাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলো কার্টিলিজ। মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল তাকানাকা।

রানার লক্ষ্য আসলে ব্যর্থ হয়েছে। ওর আঘাত যখন লাগতে যাচ্ছে, তার আগেই পিছু হটতে শুরু করেছিল তাকানাকা–এতে প্রমাণ হয়, শরীরটা প্রকাণ্ড

হওয়া সত্ত্বেও তার রিফ্লেক্স আর বডি কন্ট্রোল অবিশ্বাস্য। তা না হলে এতক্ষণে তার নাকের হাড় ভেঙে ভাঙা টুকরো সেঁধিয়ে যেত মগজে।

নাক দিয়ে লাল ধারা গড়াচ্ছে, আবার রানাকে ধরতে এল তাকানাকা। কপাল থেকে রক্ত মুছে রানাও এগোল মিলিত হওয়ার জন্য।

রানার চোখে আঙুল চালাল তাকানাকা। ঝট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে লোকটার সোলার প্লেক্সাস সই করে চালাল ডান হাতের ভাঁজ করা আঙুলের গিঁঠ। মাঝপথে কবজিটা ধরে ফেলল জাপানি দৈত্য। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল একপাশে।

রানাকে পুরো একটা পাক খাওয়াল তাকানাকা, তারপর অনায়াসে তুলে নিল নিজের কাঁধে।

রানাকে কাঁধে নিয়ে তিন কদম হাঁটবে তাকানাকা, পারলে বিজয়ী হয়েছে বলে দাবি করতে পারবে। দুই হাতের তালু দিয়ে তার দুই কানে প্রচণ্ড চাপড় মারল রানা। সেরিব্রাল হেমোরেজে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হওয়ার কথা প্রতিপক্ষের। তার বদলে শুধু ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বী, ছিটকে পড়ল একটা ট্রফি ভেস-এর উপর।

তাকানাকার কান আর মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। মাফিয়োসোদের ভিড় ভেঙেচুরে ছুটে এল সে, খপ্ করে ধরে ফেলল রানার চুল। আচ্ছন্ন বোধ করছে রানা, অসহায়; অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারল আবার ওকে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিউরিও ভর্তি একটা র‍্যাকে মাথা দিয়ে পড়ল রানা। মেঝেতে পড়ামাত্র শরীরটাকে গড়িয়ে দিল, তারপর ক্রল করে ঢুকে পড়ল বিলিয়ার্ড টেবিলগুলোর তলায়।

হতাশ হয়ে ওকে অভিশাপ দিচ্ছে জাপানি কুস্তিগির। রানা দাঁড়াল কামরার বুলেটপ্রুফ পিকচার উইন্ডোর সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে একটা বিলিয়ার্ড টেবিল ঠেলে দিল তাকানাকা।

লাফ দিয়ে সরে গেল রানা। কাঁচ ভেঙে অন্ধকার রাতে অদৃশ্য হয়ে গেল অত বড় টেবিলটা। কামরার তাপমাত্রা কমতে শুরু করল।

এগিয়ে এসে আবার রানাকে ধরল তাকানাকা। রানার ঘুসিগুলোকে সে গ্রাহ্যই করছে না। প্রকাণ্ড শরীর দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে রানাকে, এক হাতে চাপ দিচ্ছে গলায়, একই সঙ্গে হাঁটু দিয়ে খুঁজছে উরুসন্ধি। শরীরটা মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, তাকানাকা চাইছিলও তাই, কারণ ইতোমধ্যে তার খালি হাতটায় ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো চলে এসেছে।

কাঁচটা রানার চোখে চালাল তাকানাকা। কাঁচের পথ থেকে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা, তবে পুরোপুরি নয়।

ভুরু থেকে নতুন রক্ত পড়ছে রানার চোখে। তাকানাকা আবার কাঁচ চালাচ্ছে দেখে পিছু হটছে আন্দাজে, ইন্সটিঙ্কটের সাহায্যে, কারণ প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও।

ধারাল কাঁচটা ওর হাত চিরে দিল। চোখ পরিষ্কার করবার কোন উপায়

দেখছে না। তাকানাকা বিরতি না নিয়ে ছুরির মত চালাচ্ছে কাঁচটা। কেটে গিয়ে তার নিজের হাত থেকেও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে।

পিঠে লাগা ঠাণ্ডা ভাবটা ক্রমশ বাড়ছে। সন্দেহ নেই ভাঙা জানালার দিকে পিছু হটছে রানা। পায়ের তলায় আরও ভাঙা কাঁচ পাচ্ছে। পৌঁছে গেল জানালায়। এখানেই শেষ। এরপর আর যাওয়ার কোন জায়গা নেই।

লাল পরদার ভিতর দিয়ে প্রকাণ্ড কাঠামোটাকে হেলেদুলে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। পা পড়ছে ভাঙা কাঁচে। একটা এবড়োখেবড়ো, চকচকে মুঠো দেখতে পাচ্ছে।

অকস্মাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হবে, শব্দ হবে পা ফেলবার। অপেক্ষা করছে রানা। মুঠোটা ছুটে এল হঠাৎ।

নিঃশ্বাস আর পায়ের শব্দ পেয়ে ঝট করে বসে পড়ল রানা। ঝোঁক দমন করতে না পেরে জাপানি শত্রু হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল। তার মুঠো আর হাত রানার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

সিধে হলো রানা। তাকানাকার কোমর কাঁধে পেয়ে হাত দিয়ে সেটাকে আরও উপরে তুলল। নিক্ষেপটা খুব যে জোরাল বা দর্শনীয় হলো তা নয়, তবে তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। তাকানাকা নিজেই শক্তি যোগান দিয়েছে, স্থির করেছে দিক আর গন্তব্য, রানা শুধু সহায়তা করেছে তাকে–সাবলীল ভঙ্গিতে জানালা গলে বেরিয়ে গেল পুরো তিনশো চল্লিশ পাউন্ড।

পাহাড়ের পাশটা আগেই দেখেছে রানা। স্নোম্যানের নীচে বরফ ঢাকা পাথুরে পাঁচিল একদম খাড়া। এক হাজার ফুট গভীরে খেলা করে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। আরও এক হাজার ফুট নীচে দেখা পাওয়া যাবে প্রথম এক ঝাঁক ঝুল-পাথর–পতনশীল একটা শরীরের জন্য প্রথম বাধা।

তাকানাকা কোন শব্দ করেনি, অন্তত বিলিয়ার্ডরুম থেকে ওরা কেউ কিছু শুনতে পায়নি। কামরায় নীরবতা আর হিম ঠাণ্ডা নেমে এসেছে।

বিশ্বাস হচ্ছে এখনও বেঁচে আছে, টলতে টলতে জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা। কেউ একজন এগিয়ে এসে ওর চোখের রক্ত মুছে দিল। হাতের ছোঁয়াই বলে দিল, এ নাদিয়া। রানা জানে না কখন সে কামরায় ঢুকেছে। এই মুহূর্তে তাকে ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে, কেউ যেন তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

দৃষ্টি ফিরে পেয়ে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বহু জিনিস ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। মেঝেতে রক্ত। সাদা একটা দাঁত পড়ে থাকতে দেখল ও। জিভ দিয়ে তল্লাশী চালাল মাড়িতে। না, ওর নয়।

'ডি' মোনা,' বোস্টনের মাফিয়া চিফ নীরবতা ভাঙল, 'তোমার পোষা জাপানিটা কোন কম্মেরই নয়, হে। রানা হোক বা আরসালান, তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে!'

'ওর পরিচয় যাই হোক, ও আমার সঙ্গে এখানে এসেছে–আমাদের একজন অতিথি,' বলল নাদিয়া। 'সবাই দেখুন, কী জঘন্য তার পরিণতি–এখন রক্তক্ষরণে মারা যাবে ও।' বাপের দিকে মুখ তুলল। 'ধন্যবাদ, ড্যাডি, ধন্যবাদ।' রানার হাত ধরল সে। 'চলো, তোমাকে আমি তোমার স্যুইটে দিয়ে আসি।'

রানাকে নিয়ে বিলিয়ার্ডরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে নাদিয়া। কারও সাহস হলো না বাধা দেয় তাকে।

পনেরো

প্রথমে গরম পানিতে গোসল করিয়ে নিয়ে লিকুইড অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে রানার ক্ষতগুলো মুছে দিল নাদিয়া। কথা বলছে না, চেহারায় আশ্চর্য একটা থমথমে ভাব। রানাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গায়ে একটা চাদর টেনে দিল, পাশে বসে ঝুঁকে একটা চুমো খেল। 'ড্যাডির সঙ্গে বোঝাপড়াটা আজ রাতে, এখনই সেরে ফেলতে হবে–আমি যাই।'

নাদিয়ার একটা হাত চেপে ধরল রানা। 'তা হলে কথাটা জেনেই যাও, নাদিয়া। আমি আরসালান নই, তুরকিও নই।'

'তুমি মাসুদ রানা। আমি জানি।' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিধে হলো নাদিয়া। 'এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার পরে বোঝাপড়া হবে।'

'কেন?'

'কারণ তুমি আমাকে ঠকিয়েছ।'

'কীভাবে? আমি তোমাকে কোনও কথা দিয়েছিলাম?'

থমকে গেল নাদিয়া। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে লম্বা করে দম ছাড়ল ও, মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমারই ভ্রম।'

কামরা অন্ধকার করে দিয়ে স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

করিডরে তখনও নাদিয়ার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়নি, বিছানা ছেড়ে সিটিংরুমে চলে এল রানা, দরজায় বোল্ট লাগাল। স্টোররুমে ঢুকে পেনলাইট জ্বালল, তারপর স্কি, গ্র্যাপনেল হুক সহ ক্লাইম্বিং রোপ-এর কুণ্ডলী, পিটন ইত্যাদি যা যা আছে পরীক্ষা করে দেখল।

মনের ভিতর একটা তিরস্কার, তুমি সময় নষ্ট করছ। ফলে একটু হাত চালিয়ে তৈরি হচ্ছে রানা, এই সময় বেডরুম থেকে ভেসে এল ইন্টারকমের আওয়াজ।

হাতঘড়ি দেখল রানা। নাদিয়া যাওয়ার পর মাত্র পাঁচ মিনিট পার হয়েছে।

বেডরুমে ফিরে এসে রিসিভার তুলল রানা। 'ইয়েস?'

'কী ঘটতে যাচ্ছে আমি নিশ্চিত নই। তবে ড্যাডি বা চিফদের হাবভাব আমার ভাল লাগছে না। ওদের আলোচনার মূল সুরটা এরকম–ওরা তো এখন জানেই কোন রুট ধরে কী পদ্ধতিতে নিউ ইয়র্কে হেরোইন এনেছ তুমি, কাজেই এরপর আর তোমাকে ওদের কী দরকার? তাই ভাবছি...'

'হ্যাঁ, বলো কী ভাবছ?'

'ভাবছি...' খটাস করে একটা শব্দের সঙ্গে যোগাযোগ কেটে গেল।

রানা পালাবার পথ তৈরি করল বেডরুমের জানালা খুলে। বাড়ির ভিত থেকে আরও পঞ্চাশ ফুট নীচে নামল ও। রশি ধরে ঝুলে আছে, চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে পালাবার বাকি পথটা। রশির গিঁট থেকে মাপ পাওয়া যাচ্ছে–একশো পঞ্চাশ ফুট। পাহাড়ের বহিরাবরণ তৈরি হয়েছে বরফের উঁচু হয়ে থাকা ফালি দিয়ে। তবে ঢাল প্রায় পাঁচিলের মত খাড়া হওয়ায় হুকগুলো সহজে খোলা যাবে।

পায়ে ক্লাইম্বিং বুট থাকলে ভাল হত। ভাল হত যদি দেখতে পেত ঠিক কোথায় নামতে যাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্য কি আর সবদিক থেকে সাহায্য করে।

ছয় ইঞ্চি গভীর একটা রিজ-এ ভালভাবেই আটকাল হুকটা। তারপর শূন্যে পা দিল রানা। পাথুরে পাহাড়ের দিকেই মুখ, ব্যাঙের মত পিছন দিকে লাফিয়ে নামছে। অ্যালার্ম শুনবার জন্য কান দুটো খাড়া, ভয় পাচ্ছে বেডরুমের জানালায় কিংবা কোন একটা ঝুল-বারান্দায় এম-সিক্সটিন দেখতে পাবে। তবে সেরকম কিছু ঘটল না। রশির শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ও, পা রাখল বরফের কারনিসে।

রশিটা বারকয়েক খুব জোরে ঝাঁকাল রানা। রিজ থেকে মুক্ত হলো হুক। ওর মাথার পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেল রশি। হুকটা হাতে পাওয়ার জন্য রশিটা টেনে তুলতে হলো।

ত্রিশ মিনিটে এক হাজার ফুট নামল রানা। তুষার এখানে তাজা, ঢালটা নেমে গেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে। রশি ফেলে পায়ে স্কি পরে নিল ও। মার্কিন অ্যান্টি নারকোটিক স্কোয়াড আর রানা এজেন্সির রেইড শুরু হতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা দেরি। স্নোম্যান থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকতে চাইছে ও। হামলাটায় যদি ফেডারেল বাহিনী অংশ নেয়, আকাশ থেকে বাড়িটার উপর টন-টন বোমা পড়লেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এক সঙ্গে এতগুলো মাফিয়া ডনকে কালেভদ্রেই পাওয়া যায়।

মেঘ সরে যাওয়ায় তুষারের রাজ্য উদ্ভাসিত হয়ে আছে চাঁদের আলোয়। রানার শুধু তীরবেগে নীচে নামা। ঘণ্টায় অন্তত পঞ্চাশ মাইল স্পিড তো হবেই। অচেনা এলাকা, তার উপর রাত, তা না হলে স্পিড আরও বাড়িয়ে সত্তরে তুলতে পারত। স্নোম্যান কয়েক মাইল পিছিয়ে পড়েছে, দৃষ্টি সীমার বাইরে। একটা চূড়া পেরিয়ে এল, সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ল বিশাল উপত্যকা।

স্কি গান গাইছে। ওটার হিসহিস শব্দকে ছাপিয়ে আরেকটা আওয়াজ বাড়ছে। কোবরার ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

কিলার কোবরা রানার সামনে বা দু'পাশে কোথাও নেই। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাতে দূরে, তুষারের উপর দিয়ে সাদা একটা আকৃতিকে ভেসে আসতে দেখল রানা, ওর স্কি ট্র্যাক অনুসরণ করছে। কোবরার মেশিনগানের পাশে একটা স্পটলাইট ফিট করা হয়েছে। স্পিড বাড়িয়ে দিল রানা। এ ছাড়া আর কিছু করবার নেই ওর। তবে এতেও কোন লাভ হবে না। একটা হেলিকপ্টার গানশিপের সঙ্গে কি স্কি নিয়ে জেতা যায় কখনও?

একটা রিজকে পাশ কাটানোর সময় ডানদিকে ঘুরে গেল রানা। ওর নীচে বিস্ফোরিত হলো তুষার। এরকম পরিস্থিতিতে স্পিড কমাবার কথা ভাবা যায় না,

কিন্তু যদি পড়ে যায়, কোবরা ছুটে এসে স্রেফ ওর জড় কেটে ফেলবে।

বাঁক নেওয়ায় একটা দক্ষিণমুখো ঢালে পৌঁছেছে রানা। শক্ত বরফের গায়ে তুষার এখানে পাতলা আবরণ তৈরি করেছে। উঁচু একটা প্লাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে একশো ফুট নীচের ঢালে পড়ল ও। ধাক্কাটা কংক্রিটে বাড়ি খাওয়ার মত, তবে ওর স্পিড এখনও বাড়ছে। একটু আশা জাগল মনে, কোবরাকে হয়তো ফাঁকি দেওয়া সম্ভব।

তবে হঠাৎ সেটা মাথার একেবারে কাছে চলে এল। রানার সামনে ওরই লম্বা ছায়া। স্পিড খুব বেশি, তারপরও বাঁকা পথ ধরল রানা। যে আলোর বৃত্তটা ত্যাগ করে এল ও, সেটার বরফ আর তুষার মেশিনগানের বুলেট বৃষ্টিতে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

কোবরার স্পিড যেহেতু রানার চেয়ে বেশি, প্রতিবার গুলি করবার পর রানাকে পিছনে ফেলে, অনেক সামনে চলে যাচ্ছে ওটা, ফিরতে হচ্ছে বৃত্ত তৈরি করে।

রানা ওটাকে ফাঁকি দিচ্ছে কখনও ডানদিকে আবার কখনও বাম দিকে ঘুরে গিয়ে, তবে শুধু সাদা আলোর বৃত্ত ওকে গ্রাস করবার পর। গানার প্রতিবার মেশিনগান ওপেন করবার পর দেখতে পেল তার টার্গেট বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গেছে।

দু'মিনিট পর গানার আবার দেখতে পেল রানাকে। আলোর বৃত্তটা ছুটে আসছে ওকে গ্রাস করবার জন্য। ছোট একটা প্লাটফর্মে উঠতে গিয়েও রানা উঠল না, সেটাকে পাশ কাটিয়ে এসে দেখল সামনে আরও ঢালু হয়ে গেছে ঢাল।

নতুন ঢালটা ধরে একশো গজ নেমেছে রানা, কোবরার স্পিড কমে গেল। খানিকটা উপরে উঠে গেল পাইলট। স্নোম্যান থেকে সম্ভবত নতুন কোন নির্দেশ এসেছে, কারণ গানশিপের এই আচরণ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

এই সময় কোবরার রকেট পড বিস্ফোরিত হলো। মিসাইলের টার্গেট রানা নয়। ওর মাথার অনেক উপর দিয়ে ছুটে গেল সেগুলো, বিস্ফোরিত হলো সামনের উঁচু ঢালের তুষারে। গোটা ঢাল খসে পড়ছে। একটা গর্জন ক্রমশ বাড়ছে। গুরুগম্ভীর আওয়াজটা গোটা উপত্যকা দখল করে নিচ্ছে। টন টন তুষার খসে পড়ছে আলগা আরও তুষারের স্তূপে, পরিমাণে দ্রুত বাড়ছে, ভয়ানক চেহারা পাচ্ছে সাদা একটা আলোড়ন।

কোবরা আরও রকেট ছুঁড়ল। তুষারের সঙ্গে জমাট বরফ ভাঙতে শুরু করায় সাদা ঢাল কালো হয়ে যাচ্ছে। শুরু হয়ে গেল তুষারধসের অদম্য প্রক্রিয়া। আরও রকেট ছুটল।

তারপর দেখা গেল উপত্যকার পুরো পুবদিকটা নেমে আসছে। দেখে মনে হলো প্রচণ্ড ভূমিকম্পে থরথর করে কাঁপছে ক্যাসকেইড পর্বতমালা। রানার স্কির নীচে ঝাঁকি খাচ্ছে তুষার। গাছের সরু একটা রেখা স্রোতের নীচে চোখের পলকে হারিয়ে গেল। ধাবমান তুষার একটা ঝড়ো বাতাস তৈরি করছে, উপত্যকার পাঁচিলগুলো যেন উড়িয়ে দেবে।

ক্যামপেরোর দেখানো ছবিটার কথা মনে পড়ল রানার। আত্মরক্ষার কোন

উপায়ই লোকগুলোর ছিল না। ওরও নেই।

উপত্যকাটা দশ মাইল লম্বা। রানা ছুটছে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে। কিন্তু উপত্যকার পুরো একটা দিক প্রকাণ্ড স্রোতের আকৃতি নিয়ে ওর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ গতিতে নেমে আসছে।

সেই স্রোত একটা ঢেউ হয়ে উঠল। কাছে চলে আসতে ওটার আসল রূপ দেখতে পেল রানা। একতলা বাড়ির সমান অসংখ্য বোল্ডার ধাবমান ত্রিশ ফুটী পাঁচিলের সঙ্গে নেমে আসছে। ঢেউ বা পাঁচিলটা আরও কাছে চলে আসতে পায়ের নীচে জমিন এমন কাঁপতে শুরু করল যে রানা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। একেবারে শেষ উপায় হিসাবে উপত্যকার আরেক দিকের উপরের ঢালের দিকে ঘুরতে চেষ্টা করল ও। জমাট তুষারের প্রথম চাপড়াগুলো ওর পায়ের চারদিকে নাচানাচি শুরু করল। কয়েকটা আঘাত করল পিঠে ভয়াবহ তুষার ধসের রক্ত হিম করা গর্জনে ব্যথা করছে কান।

রানাকে উঁচু করা হচ্ছে। অথচ তারপরও নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে ও। ফুলে-ফেঁপে উঠছে ওর নীচে তুষার আর বরফ। ঢেউটা ওকে যেন নিজের পিঠে তুলে নিয়ে ছুটে চলেছে। মাত্র এক কি দু'সেকেন্ড। তারই মধ্যে রানা উপলব্ধি করল তুষার ধসের কী ভীষণ ক্ষমতা–ঈশ্বর যেন খেপে গিয়ে দুনিয়াটাকে ভেঙে ফেলতে চাইছেন।

পাঁচিলটা রানার উপর খাড়া হলো। ওর পা টেনে নেওয়া হলো। অন্ধকার, কালো হয়ে গেল সব। তুষার ধস ছুটে চলেছে। চাপা পড়ল মাসুদ রানা। জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে।

ষোলো

চৈতন্য ফিরে পাওয়ার পরও নিশ্চিত হতে পারছে না বেঁচে আছে কিনা। তবে–নিজের সঙ্গে আলাপ করছে রানা–ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আছি বটে, কিন্তু এখনও জমাট বাঁধিনি।

চোখে কিছু দেখছে না। ওর উপর রাজ্যের তুষার। শরীরটাকে কুণ্ডুলী পাকিয়ে নিয়েছিল–ফলে বুক, হাত আর হাঁটুর মাঝখানে এয়ারপকেট তৈরি হয়। এই কৌশলটা জানা ছিল বলে এখনও অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়নি। ডিম্বাকৃতি না হতে পারলে দম নিতে পারত না, তাপমাত্রা হারিয়ে বরফ হয়ে যেত শরীর, চারদিক থেকে টান পড়ায় কাঠামোটা ছিঁড়ে চার টুকরো হয়ে যেত।

সারা শরীরে প্রচুর কাটাকুটি আর ক্ষত থাকলেও ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে। পরীক্ষা করে দেখল, কোথাও কোন হাড় ভাঙেনি।

অনেক কষ্টে বাঁ হাতের আস্তিন কবজির উপর তুলল রানা। আলোকিত ডায়াল অনুসারে সকাল দশটা বাজে, জ্যান্ত কবর হওয়ার পর পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রানা এজেন্সি আর নুমার হামলা শুরু হয়েছে, সে-ও পাঁচ ঘণ্টা আগে।

হাত লম্বা করে পা ছুঁলো। স্কিগুলো নেই। চেষ্টা করল উঠে বসতে। গায়ে চেপে বসা তুষার এক ইঞ্চি ছাড় দিতেও রাজি নয়। আঁট করে আটকে রেখেছে ওকে।

একটু হয়তো দেরি হচ্ছে, তবে শেষ পর্যন্ত জমাট বরফ হওয়াই ওর শেষ পরিণতি। যে বাতাস ফুসফুসে গ্রহণ করছে, এরই মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সেটাকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

একটা হাতের কবজি কীসে যেন আটকাচ্ছে। হাতড়াল রানা। স্কি পোলের স্ট্র্যাপ ঠেকল আঙুলে। তাড়াতাড়ি পোলটা টেনে নিল নিজের দিকে। বেঁকে গেলেও, জিনিসটা ভাঙেনি।

ওর উপর দিকে তুষার যদি পাঁচ ফুটের কম গভীর হয়, পোলের সাহায্যে একটা গর্ত তৈরি করে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে পারবে। পোলটা উপর দিকে খাড়া করবার চেষ্টা চালাল, ড্রিলের মত মোচড়াচ্ছে। যতটা সম্ভব উঠল পোল, কিন্তু ডগাটা আলো বা বাতাসের নাগাল পায়নি। অনেক গভীরেই ডুবেছে এমআরনাইন।

পোলটা টেনে নিল রানা। বাতাস বা আলো না পাওয়ার মানে এই নয় যে পোলের নাগালের মধ্যে নেই ও-সব। পোলটাকে আরও কয়েক দিকে পাঠানো দরকার।

অক্সিজেনের অভাবে রানা হাঁপাতে শুরু করেছে। তবে সিদ্ধান্ত থেকে এক চুল নড়ল না। যতক্ষণ পারবে লড়ে যাবে।

পঁচিশ, কিংবা হয়তো দুশো পঁচিশবারের বার, নিজের পিছনে এবং খানিকটা উপরে নিরেট কিছুতে ঠেকল পোলের ডগা। বারবার টোকা দিয়ে নিশ্চিত হলো পাথরে নয়, কাঠে বাড়ি খাচ্ছে। নিশ্চয়ই একটা গাছ, শিকড় ছিঁড়ে পাহাড়ের ঢাল থেকে নামিয়ে এনেছে তুষারধস। পোল এরই মধ্যে রানা আর গাছটার মাঝখানের কিছু তুষার আলগা করেছে, সেগুলো হাত দিয়ে সরাচ্ছে ও।

গাছের দিকে পাঁচ ফুট এগোতে নব্বুই মিনিট লাগল। হাতের দস্তানা খুলে আঙুলে ওটার ছাল অনুভব করল রানা। একটা ফার গাছ, কাণ্ড থেকে নিয়মিত দূরত্বে শাখা বেরিয়ে ধাপ তৈরি করেছে।

আগের চেয়ে দুর্বল আর ঠাণ্ডা রানা, তবে এখন বাঁচবার আশা ওকে উজ্জীবিত করে তুলেছে।

গাছটা ধরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উপরে উঠছে ও। কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে ওর মগজ। হ্যালুসিনেশন ভোগাচ্ছে ওকে। এক পর্যায়ে নিশ্চিত মনে হলো–তুষার খুঁড়ে নীচে নামছে ও, উপরে উঠছে না।

জোর করে মনের সঙ্গে যোগাযোগটা কেটে দিল রানা। তুষার সরাচ্ছে যান্ত্রিক একটা মেশিন–রোবট।

একটু যেন আলগা লাগছে ঝুরঝুরে বরফ। তবে সংকেত বা নমুনাটা রানা গ্রাহ্য করছে না। আলোও দেখতে পাচ্ছে, ভাবল এটাও হয়তো মনের কারসাজি। তারপর ওর উপর তুষার খসে পড়ল। হাত দিয়ে খাবলা মেরে কিছুই পেল না–শুধু বাতাস।

তাজা অক্সিজেনে আবার শ্বাস নিচ্ছে রানা। এক মিনিট পর সারফেস ভেঙে ফেলল, ক্রল করে বেরিয়ে এল কবর থেকে।

হাতঘড়িতে বিকেল চারটে। পাঁচ ফুট তির্যক আর আট ফুট খাড়া পথ উঠতে সময় লেগেছে ছয় ঘণ্টা। ওর কাপড়ের সুতোর ফাঁকে বরফ জমেছে, ঠাণ্ডায় সাদা হয়ে গেছে গায়ের চামড়া। তবে রানার কোন অভিযোগ নেই।

তুষারে উপুড় হলো ও। উপত্যকার মেঝে উঁচু-নিচু, ভাঙা-চোরা আর এলোমেলো হয়ে আছে। সিদ্ধান্ত নিল কী ঘটেছে দেখবার জন্য স্নোম্যানে ফিরে যাবে। ঠিক এই সময় দেখল ছোট একজোড়া কালো বিন্দু ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ওরা রানা এজেন্সির লোক হতে পারে, কিংবা এএনএস-এর সদস্য-সার্চ করতে বেরিয়েছে।

পরমুহূর্তে সন্দেহ হলো রানার। স্নোম্যানের যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক, তাদের কাছে হেলিকপ্টার আছে। এরা দু'জন স্নো শু পরে হাঁটছে। নিশ্চয় পালাচ্ছে।

রানা নিশ্চিত, ওকে তারা এখনও দেখতে পায়নি। তুষারের গায়ে তুষার, ওকে আলাদা করবার উপায় নেই। স্থির হয়ে শুয়ে থাকল ও। অপেক্ষা করছে।

দূরত্ব কমে এক হাজার ফুট হলো। ওদেরকে এখন চেনা যাচ্ছে। একজন ক্যামপেরো। অপরজন নাদিয়া। দু'জনেই সোজা ওর দিকে আসছে। বাপের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে নাদিয়া।

ক্যামপেরোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কপাল আর চোয়ালের উপর ক্ষত। খানিক পর পরই আকাশের দিকে মুখ তুলছে সে।

নাদিয়াও ক্লান্ত, তবে ক্লান্তির চেয়ে যেন বিষণ্নতাই বেশি কষ্ট দিচ্ছে তাকে।

ওরা যদি দিক না বদলায়, রানাকে দেখতে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। ক্যামপেরোর হাতে মস্ত একটা ল্যুগার রয়েছে। রানা নিরস্ত্র।

যে গর্ত থেকে বেরিয়েছে, ক্রল করে তার ভিতরই আবার ঢুকল রানা। ক্যামপেরোকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়ার জন্য এই আড়াল নেওয়ার প্রয়োজন আছে। একটা ফাঁদও পাততে চায়, কাজে লাগলে লাগল, না লাগলে নাই।

বাপ আর মেয়ে যখন আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সিধে হলো রানা।

দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন একটা ভূত তাদের পথ আগলেছে।

'আপনি মারা গেছেন!' ক্যামপেরো যেন নিজেকেই যুক্তি দিতে চাইছে।

'আমি না, মরেছেন আসলে আপনি,' বলল রানা। 'কাল রাতে আমার বন্ধুরা এসে আপনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

ক্যামপেরোর ঠাণ্ডা হিম ফ্যাকাসে চেহারা লালচে হয়ে উঠল। তাতেই রানা জবাব পেয়ে গেছে।

ক্যামপেরোর বিস্ময় এখনও কাটছে না। 'কপ্টারের লোকজন আপনাকে মরতে দেখেছে, মিস্টার রানা। সেনসরও সংকেত দেয়, আপনি মারা গেছেন।'

'ভুল করেছে ওরা। পিস্তলটা এদিকে ছুঁড়ে দিন, মিস্টার ক্যামপেরো। ভাল কথা, রাজীব ত্রিপাঠি কোথায়?'

'গুরুজি বম্বিং-এ মারা গেছেন,' বলল নাদিয়া। 'চিফরাও সবাই…'

পিস্তল তুলে রানার বুকে লক্ষ্যস্থির করল ক্যামপেরো। মাজল কাঁপছে। বেশি সময় নেয়নি, ট্রিগার টেনে দিল। রানার বাম দিকে লাফিয়ে উঠল খানিকটা তুষার।

'ড্যাডি!'

ক্যামপেরো হাত দিয়ে চোখ রগড়ে সামনে এগোল। তার প্রাসাদ নেই। মিলিয়ন বা বিলিয়ন হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে জ্যান্ত জাদুর কাঠি–ভগবান রাজীব ত্রিপাঠি। হঠাৎ করেই সিসিলিয়ান ষাঁড় ক্লান্ত এক অথর্ব বুড়োয় পরিণত হয়েছে। থেমে আবার গুলি করল সে। রানার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। কাল এই লোক তিনশো গজ দূর থেকে ছুটন্ত রানাকে এক গুলিতেই ফেলে দিতে পারত। কাল সে কাঁপছিল না।

তুষারে নিচু হলো রানা। রিফ্লেক্স ধীর হলেও, ক্যামপেরোর নিশানার উন্নতি হচ্ছে।

আবার গুলি করল ক্যামপেরো। শরীরটাকে গড়িয়ে দিচ্ছে রানা। আরও একটা বুলেটকে ফাঁকি দিল ও।

'ড্যাডি! ওকে আমি মারব! ল্যুগারটা তুমি আমাকে দাও!' বাপের নাগাল পাওয়ার জন্য তুষারের উপর দিয়ে ছুটল নাদিয়া।

মেয়েকে সামলাবার জন্য রানার দিকে পিছন ফিরল ক্যামপেরো। পিছু হটছে। নাদিয়ার চোখে চোখ রেখে কী যেন খুঁজল সে। কে জানে, নিজের মেয়েকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারছে না। 'না! আমার হাতেই মরতে হবে ওকে।'

'তোমার হাত কাঁপছে! দাও ওটা, আমি মারি!' হঠাৎ বাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাদিয়া। পিস্তলটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিয়েছে।

ক্যামপেরো স্থির হয়ে গেল রানার পাতা ফাঁদের ঠিক কিনারায়। নাদিয়া পিছিয়ে গেল দু'পা। তারপর পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল।

পরিষ্কার দেখল রানা। ট্রিগারে চাপ দেওয়ার সময় চোখ বুজে আছে নাদিয়া।

একটা ঝাঁকি খেল ক্যামপেরো। বাম কাঁধ উড়ে গেছে। আরও এক পা পিছু হটল সে। পড়ে গেল রানার সেই গর্তের ভিতর।

সামনে এগোল রানা। নাদিয়া পিছু হটল।

গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে নীচে তাকাল রানা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ক্যামপেরো। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার বুক আর পিঠ।

গর্তটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। 'নাদিয়া!' ওকে স্তম্ভিত করে দিয়ে নিজের কপালের পাশে পিস্তল চেপে ধরেছে মেয়েটা।

খালি হাতটা রানার বুকে তাক করল নাদিয়া। 'তুমিও, শেষ পর্যন্ত তুমিও আমাকে ঠকালে, রানা। প্রথমে ড্যাডি…আমার কি না কেড়েছে ওই লোক–আদর্শ, নীতি, সততা, পবিত্রতা, স্বাধীনতা, এমনকী গুরুজিকেও। যখন মারা যাচ্ছি, তখন তোমাকে দেখলাম। কী ছিল তোমার মধ্যে জানি না, মনে হলো এই লোককে ভালবাসতে পারলে আবার আমার পুনর্জন্ম হবে, আমি নিজেকে আবার ফিরে

পাব। কিন্তু জানতাম না তুমিও আমাকে...' রানা লাফ দিয়েছে, দেখতে পেয়ে ল্যুগারের ট্রিগার টেনে দিল নাদিয়া।

নাদিয়াকে আগের জায়গায় না পাওয়ায় তুষারের উপর পড়ল রানা। উঠতে যাবে–পরিচিত স্নায়ু-কাঁপানো একটা অনুভূতি হলো। ওর নীচে তুষার কাঁপছে।

উপত্যকার পুরো একটা দিক, যেদিকটা কাল রাতে ধসে পড়েনি, প্রকাণ্ড একটা স্রোতের আকৃতি নিচ্ছে। প্রথম তুষারধসটা উল্টোদিকের ঢালটাকে দুর্বল করে তুলেছিল। আরেকটা তুষারধস শুরু করবার জন্য দরকার ছিল শুধুই একটা বুলেটের তৈরি ভাইব্রেশন।

শত শত, হাজার হাজার টন তুষার খসে পড়ছে উঁচু চূড়াগুলো থেকে। নামবার পথে আরও সংগ্রহ করছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে গতিও।

চেঁচিয়ে উঠল রানা। কিন্তু তুষারধসের গর্জনে নিজের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল না।

ট্রিগার টানলেও, যে-কোন কারণেই হোক ল্যুগার থেকে গুলি বেরোয়নি। পিস্তলটা ফেলে দিয়ে ফিরতি পথ ধরে ছুটছে নাদিয়া। ছুটছে ফুলে-ফেঁপে প্রকাণ্ড হতে থাকা তুষারধসের দিকেই।

বাঁচতে হবে, এই ভয়ে আতঙ্কিত নাদিয়া, সে ছুটছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে।

তুষার কাঁপছে, তা সত্ত্বেও নাদিয়ার পিছু নিয়ে ছুটছে রানা। ক্লান্তি পিছিয়ে দিচ্ছে ওকে। পায়ে স্নোশু-ও নেই। নীচের ঢালগুলোয় পৌঁছে গেছে তুষারধস। উপত্যকায় নেমে আসবার আগে অবিশ্বাস্য গতি পাচ্ছে। গাছের সারি বা রেখাগুলো এক পলকে গায়েব হয়ে গেল, এক মাইল লম্বা সাদা হাত শিকড় টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে রানা, ডাকছে নাদিয়াকে, হোঁচট খেতে খেতে ছুটছে ওর পিছনে। ঠিক তখনই কী মনে করে পিছন দিকে একবার তাকাল নাদিয়া। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। জানে, ও তাকে বাঁচাতে চাইছে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। একবার তার ইচ্ছে হলো, বাঁচে; এরকম একজন নিঃস্বার্থ মানুষের জন্য বাঁচা যায়। কিন্তু তারপর? তারপর রানাকে ছেড়ে আরও উপরে উঠে গেল তার দৃষ্টি

গায়ে এএনএস লেখা একটা কপ্টার ঝুলছে রানার মাথা থেকে বিশ ফুট উপরে। সামনের দিকে বসে রয়েছে ওর দুই বন্ধু–একজন এএনএস সদস্য নিক হিউবার্ট, তারপাশে বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। উন্মত্তের মত হাত নাড়ছে সোহেল, বোঝা গেল অবশেষে রানা ওদেরকে দেখতে পাওয়ায় পরম স্বস্তি বোধ করছে সে। তুষারধসের গর্জনে কপ্টারের আওয়াজ পুরোপুরি চাপা পড়ে গেছে।

রশির একটা মই নেমে এল কপ্টার থেকে। লাফ দিয়ে সেটা ধরল বটে রানা, তবে উপরে উঠছে না, হিউবার্টকে ইঙ্গিতে বলছে–সামনে এগোও।

উত্তরে হাত নাড়ছে সোহেল, মই বেয়ে উপরে উঠতে ইশারা করছে।

মাথা নাড়ল রানা, হাত লম্বা করল নাদিয়ার দিকে।

অগত্যা বাধ্য হয়ে সেদিকে কপ্টার ছোটাল হিউবার্ট।

জমিন থেকে সাত ফুট উপরে ঝুলছে রানা। অনেকটা এগিয়ে ছিল নাদিয়া, তবে কপ্টারের সঙ্গে সে পারবে কেন।

একদিক থেকে রানাকে নিয়ে কপ্টার, আরেক দিক থেকে অসংখ্য বোল্ডার নিয়ে তুষারধস–দুটো প্রায় একই সময়ে নাগাল পেতে চলেছে নাদিয়ার। তুষারধস বিশ ফুট উঁচু। স্পিড কপ্টারের মতই।

হঠাৎ করে খুব ছোট দেখাল মেয়েটাকে–আলোড়িত সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে গাঢ় একটা মূর্তি। গলার আওয়াজ না ভাঙা পর্যন্ত চিৎকার করল রানা। অস্থির কপ্টারের নীচে মই লাফ দিচ্ছে আর পাক খাচ্ছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে থমকাল নাদিয়া। হয়তো বাঁচবার সাধ হয়েছে তার। কিংবা হয়তো মরতে ভয় পাচ্ছে। কপ্টার নিচু হলো। রানাকে নিয়ে মইটাও। যতটা পারা যায় হাত লম্বা করল রানা।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল নাদিয়া। তার চোখে অভিমান দেখতে পেল রানা। দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে।

হাতটা এতক্ষণে বাড়াল নাদিয়া। খপ করে ওর কবজি চেপে ধরল রানা। সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হতে শুরু করল কপ্টার, হিউবার্ট প্রাণপণে চেষ্টা করছে ধেয়ে আসা সাদা পাঁচিলটার নাগালের বাইরে উঠে যেতে।

প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল তুষারধস, উঠে আসছে নাদিয়ার কোমরে। কিছু বলল সে, কিন্তু রানা শুনতে পেল না। তবে তার চেহারা থেকে ধুয়ে মুছে গেছে অভিমান আর ভয়। সেখানে এখন শুধু আশ্চর্য একটা প্রশান্তি আর অপার্থিব মুগ্ধতা।

ওকে টেনে উপরে তুলতে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু নতুন একটা তুষারধসের ঢেউ প্রচণ্ড টানে রানার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল নাদিয়াকে। মুহূর্তে তুষার গিলে ফেলল তাকে। সাদা জ্যান্ত প্রাণীর মত সচল, স্তূপ হচ্ছে, সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দিচ্ছে গভীরে। আরও উঁচু হয়ে আসছে পরবর্তী ঢেউ। তাই দেখে দ্রুত তুলে নিচ্ছে সোহেল মইটা। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে কোথাও নাদিয়ার চিহ্নও দেখতে পেল না রানা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কপ্টারের ভিতর উঠে এল রানা। ওখান থেকে তাকিয়ে দেখল গড়িয়ে আর আছড়ে পড়ে উপত্যকার কোথায় পৌঁছে স্থির হয় তুষারধস। প্রচণ্ড গর্জনে কান পাতা দায়, সোহেল বা হিউবার্টের সঙ্গে রানা কোন কথা বলতে পারছে না।

অবশেষে তুষারধস থামল। উপত্যকা এখন স্থির আর সাদা। আকাশটাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মুঠোটা খুলল রানা। আঙুলগুলোয় রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। তালুর ভিতর হীরের সেই আঙটিটা।

'মেয়েটার?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। রানা মাথা ঝাঁকাতে আবার বলল, 'ধরেছিলি তো জোরেই, তারপরও ছিনিয়ে নিয়ে গেল!'

কথা না বলে আঙটির মাথাটা খুলল রানা। ছোট্ট চারকোনা ঘরের ভিতর

সাদা পাউডারের চিহ্ন।

'কী জিনিস?' সোহেল আর হিউবার্ট এক সঙ্গে জানতে চাইল।

জিনিসটা কী জানবার জন্য পরীক্ষা করবার দরকার নেই রানার। নিচু গলায় বলল, 'অনেকদিন থেকেই আত্মহত্যা করার কথা ভাবত। হেরোইন-ওভারডোজ।'

বাঁক ঘুরে স্নোম্যানের দিকে ছুটল হেলিকপ্টার।

আবার একবার নীচের তুষারে চোখ বুলাল রানা। নেই, কোন চিহ্নই নেই।

সান্ত্বনা এটুকুই, মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি মেয়েটাকে।

***